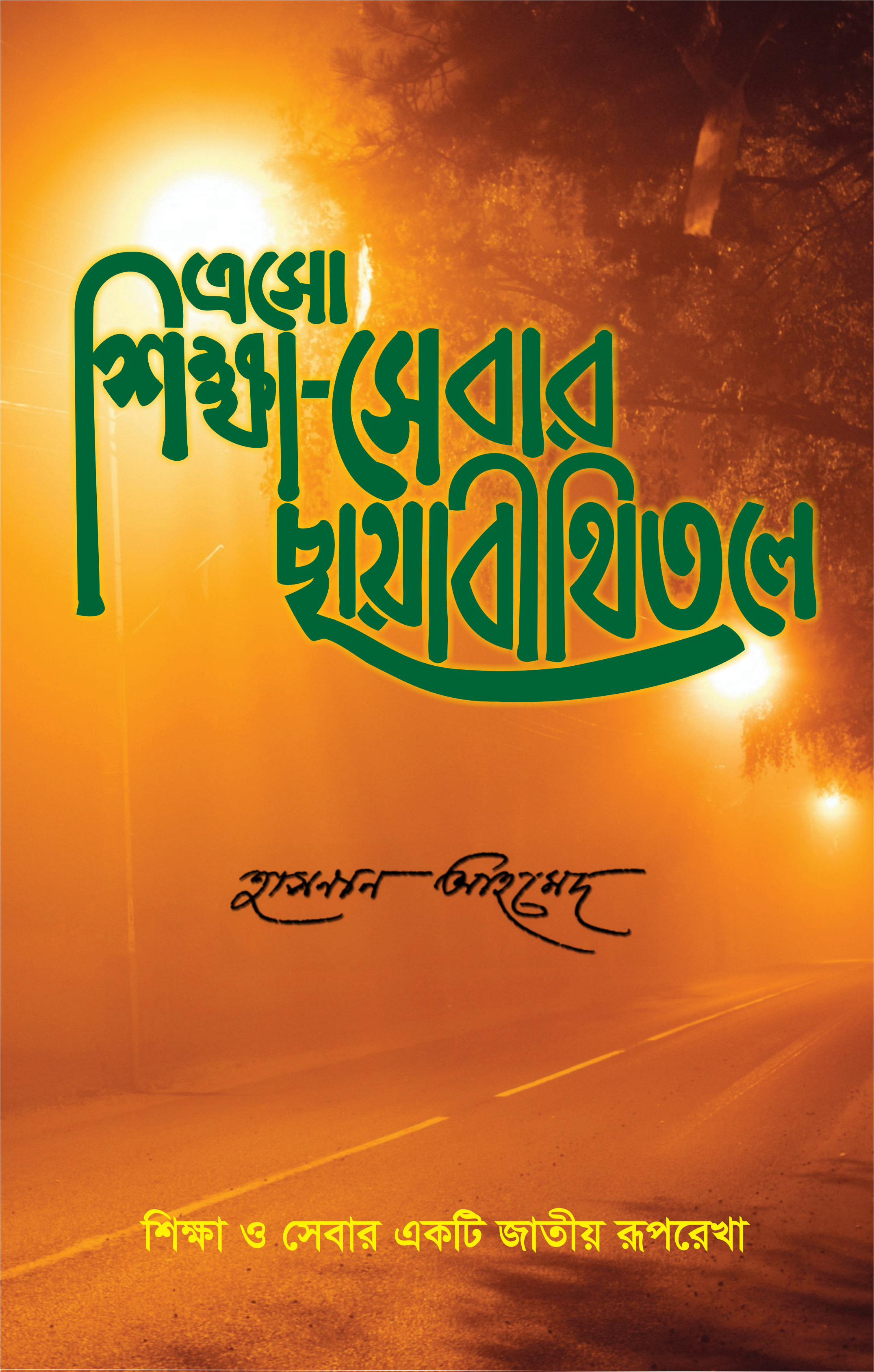

এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

হাসান আহমেদ

শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, প্রায় চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখালেখি সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

(তৃতীয় কভারে বাকি অংশ)

ড. আহমেদ চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া’র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তিনি সামষ্টিক উন্নয়ন মডেলের সাথে অনন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ’৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– ‘জীবনক্ষুধা’, ‘প্রতিদান চাইনি’, ‘কিছু কথা কিছু গান’, ‘অপেক্ষা’, ‘শেষবিকেলের পথরেখা’, ‘সত্যের গল্প গল্পের সত্য’, ‘সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম’, ‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা’, ‘এইসব দিনকাল’ প্রভৃতি।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

এসো
শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

হাসনান আহমেদ

শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা

প্রকৃতি

এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ
হাসনান আহমেদ

অলংকরণ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা, linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০০৪-৩

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

(এই বই বিক্রি থেকে অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাজে ব্যয় করা হবে)

Eso Shiksha-Sebar Sayabithitole by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, December, 2022
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা
জ্ঞানতাপস শিক্ষাবিদ
প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা (কবিতা)
প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
অপেক্ষা (উপন্যাস)
শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
নৈঃশব্দ্যের কথকতা (উপন্যাস)
এইসব দিনকাল (ছোটগল্প)

আমার কথা

জীবনের পথ ও পাথেয় নিয়ে অনেক দিন আগে থেকেই কিছু লিখবো লিখবো করছিলাম। সে ইচ্ছে বাস্তবে রূপ নিলো। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নও দেশের সার্বিক উন্নয়নের একটা পরিমিতি। ব্যষ্টির শিক্ষা ও সেবার উন্নতি ছাড়া সামষ্টিক উন্নয়ন দুরাশা মাত্র। তাই দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যষ্টির শিক্ষা ও সেবার পথকে বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমি সে পথকে বেছে নিয়েছি। এ নিয়ে ভূমিকা দিতে ও সমস্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক অনেক কথাই লিখেছি, একটা উন্নয়ন মডেল দাঁড় করাতে চেয়েছি।

আমার লেখালেখির সচরাচর যে ভাব ও ভাবনা– তার বাইরে আমি যেতে পারিনি। কোনো কোনো ঘটনা বা পরিবেশের ভাষাচিত্র লেখায় তুলে ধরতে হয়েছে। অনেক শ্রুতিকটু বাস্তব কথা লিখতে হয়েছে। এটা কারো কষ্টের কারণ হতে পারে। মূলত বাস্তবতাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করতে পারলে বাস্তবানুগ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুরূহ। এটা কারো প্রতি কোনো অবিবেচনাপ্রসূত বা বিদ্বেষবশত নয়, বরং পরিবেশ-পরিস্থিতির বাস্তবতা তুলে ধরার কারণে করতে হয়েছে।

আমি বিশ্বাসী যে, আমার এ দেখানো উন্নয়নের পথে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনগোষ্ঠী সুষ্ঠু জাতীয় চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হবে, মানবসম্পদে রূপ নেবে। এ দেশের ধর্মভীরু জনগোষ্ঠী মানবকল্যাণে পথের দিশা পাবে; অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

লেখায় অনেক কথা ঘুরে-ফিরে এসেছে। পাঠকবর্গ এটাকে দোষ না ধরে আমার আনাড়ি-অপরিণত লেখার প্রতি সদয় হবেন এবং আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

এ লেখায় ও ভাবনায় যাঁরা আমাকে মতামত দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী, প্রফেসর ড. এম. এ. বাকী খলীলী, প্রফেসর ড. মো. সাদিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. ফরিদ এ. সোবহানী, প্রফেসর ড. মহান উদ্দিন, প্রফেসর ড. কাওসার আহাম্মদ, প্রফেসর মো. মিজানুর রহমান, জনাব মো. মোশাররফ হোসেন, জনাব মাছুম বিল্লাহ, প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম, প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান, প্রফেসর ড. এ.জেড.এম. জাকারিয়া, ড. মোহাম্মদ কামাল হোসেন, ড. মো. জাকির হোসেন তালুকদার, প্রফেসর ড. মো. আবু তালেব, প্রফেসর ড. মো. একরামুল ইসলাম অন্যতম। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাঁরা অভিমত দিয়েছেন ও ভূমিকা লিখেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

সকল পক্ষের আশানুরূপ অংশগ্রহণে মডেলের বাস্তবায়ন দেখতে পেলেই আমি নিজেকে সার্থক মনে করবো।

ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২২

(হাসনান আহমেদ)

ভূমিকা

আমি বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ রচিত ‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ শীর্ষক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। গ্রন্থটিতে প্রফেসর আহমেদ বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির একটি বস্তুনিষ্ঠ ও সৃষ্টিশীল মূল্যায়ন করেছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে খুব কাছ থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব অত্যন্ত দরদ ও সংবেদনশীলতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা ক্ষেত্রের একজন চিন্তাবিদ ও নিবেদিতপ্রাণ গবেষক হিসেবে মাঠ পর্যায়েও তাঁর রয়েছে চার দশকের অভিজ্ঞতা।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। স্বাক্ষরতার হার অনেক বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার হারও অনেক। সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং প্রযুক্তি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় আমাদের গ্রাজুয়েটদের সংখ্যাও অনেক। ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংখ্যা বিচারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই মান বাড়েনি। এর পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে অধগতি তা কেবল হতাশাব্যঞ্জক নয়, প্রচণ্ড উদ্বেগেরও। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ফল আশানুরূপ নয়। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা জরুরি। সৎ, বিবেকবান, মানব ও সমাজদরদি মানুষের সংখ্যা এখন কম হলেও এমন মানুষ আমাদের সমাজে আছেন। এখন প্রয়োজন এ ধরনের সমাজ ও মানব-কল্যাণকামী মানুষদের একত্রিত করা, এদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

ড. হাসনান আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে এ সম্পর্কে চিন্তা করছেন এবং লেখালেখিসহ ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত পরিসরে তাঁর সাধ্যানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এখন তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন জাতীয় পর্যায়ে একটি ছাতাসদৃশ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে তিনি শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা সম্বন্ধে কেবল তাঁর চিন্তাধারাই তুলে ধরেননি বরং এর আদর্শিক ও চিন্ত্য ভিত্তি, সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থসংস্থান পদ্ধতি, সেবাদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাঁর সুবিবেচিত অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন।

ছয়টি অধ্যায়ে তিনি গ্রন্থটিকে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো: ১. শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতা; ২. শিক্ষার সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত; ৩. শিক্ষা ও সেবায় ধর্মের প্রয়োগিকতা ও ধর্ম-কর্ম; ৪. মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা; ৫. শিক্ষা-সেবা সমাজ; ৬. শিক্ষা-সেবার নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম।

বক্তব্যের যথার্থতা প্রামাণের জন্য ড. আহমেদ যেমন যুক্তি দিয়েছেন ও তার বিপুল অভিজ্ঞতার সহভাগিতা করেছেন, ঠিক তেমনি বাস্তব জীবন থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন। তার ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং সুখপাঠ্য।

একজন চিন্তাশীল মানুষের সব কথা ও ব্যাখ্যার সাথে অপর একজন ভাবুক মানুষ যে একমত হবেন তা প্রত্যাশিত নয়। এমন হলে তো মানুষ যন্ত্র হয়ে যায়। একজন দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও তুলনামূলক ধর্ম-দার্শনিক হিসেবে তার সব বক্তব্য ও বিশ্লেষণের সাথে আমি যে সব ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করি তা নয়; এতৎসত্ত্বেও আমি তাঁর গ্রন্থের একজন গুণমুগ্ধ পাঠক এবং আমি তাঁর মানবকল্যাণকামী চিন্তা কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করি। তিনি যে মানসিক অবস্থা ও অবস্থান থেকে এ বইটি লিখেছেন আমি সেজন্য তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঠিক একইভাবে সব লেখকই যে সমরূপ ভাবনা, একই ধরনের শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করবেন তাও স্বাভাবিক নয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য প্রকাশের বেলায়ও তাঁর সাথে আমার কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তাঁর মূল বক্তব্য সমর্থনযোগ্য।

আমরা শিক্ষা, সমাজজীবন ও মানবসেবার ক্ষেত্রে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। বিপুলসংখ্যক মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী হয়ে যাচ্ছে। নিষ্ঠুরতা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয় বিশ্বকে গ্রাস করছে। অপরিণামদর্শিতা, সৃষ্টিশীল অভিযোজনের অভাব এক সর্বগ্রাসী পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে। এমনই একটি সময়ে সমমর্মিতা ও পরার্থপরতার মনোভাব নিয়ে লেখা এমন একটি বইয়ের বড়ই প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা যে, প্রফেসর হাসনান আহমেদ সেই প্রয়োজনটি পূরণ করার জন্য গভীর আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ নিজেদের কর্মদোষে সম্পদের পরিবর্তে বোঝা, লেখকের কথায় ‘আপদ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইটির মনোযোগী অধ্যয়ন পাঠকের শিক্ষা-চিন্তা ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ বইতে পাঠক একটি বাস্তবসম্মত কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের দিশা পাবেন। আমি বইটির বিপুল পাঠকপ্রিয়তা ও লেখকের সুস্থ, দীর্ঘ ও কর্মময় জীবন কামনা করি।

ঢাকা, ১০/১২/২০২২ ইং

দর্শনাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান
ভাইস চ্যান্সেলর, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
সাবেক চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিশিষ্টজনদের অভিমত

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ বিপুল জীবন-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সমাজবিশ্লেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজ-বাস্তবতার নিকষিত দর্শক এবং সুলেখক। অপ্রিয় সত্যকথন তাঁর লেখালেখির বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা বই 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' আমি পড়েছি। তাঁর নির্মোহ-পক্ষপাতশূন্য বলিষ্ঠ লেখনীতে ফুটে উঠেছে এ দেশের সমাজদর্শন, শিক্ষা, রাজনৈতিক বাস্তবতা, ধর্মদর্শন ও বিচিত্র সামাজিক নকশা। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসেবার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন।

বস্তুত জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষা ও সেবা না দিতে পারা আমাদের জাতীয় সমস্যারই একটা বড় অংশ। এ দেশে সুদীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা ও সমাজসেবা উপেক্ষিত হয়ে আসছে। কোনো সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা ও সমাজসেবার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন অনেকটাই হয় না। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া এ দেশে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আবার শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের ভূমিকাই মুখ্য। এজন্যই শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক– এই ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি আশা করা যায় না। প্রতিটা সমাজে বসবাসরত মানুষের একটা সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত অংশকে দিয়ে সেই সমাজের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সমাজের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করলে সঠিক সময়ে সঠিক লোক দিয়ে সঠিক কাজটা করা সম্ভব হয়। সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, যে দায়িত্ব 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' পালন করতে পারে। প্রতিটা এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা-সেবা সমাজ অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক শিক্ষাবলয় গড়ে তুলতে পারলে সমাজে শিক্ষার উন্নতি হবে, সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও অপচিন্তা অনেকটাই কমে আসবে।

জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করতে হবে। সুশিক্ষিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এই শ্রেণির আলোকিত লোক সমাজে থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। অনেকেই সমাজের করুণ-ভগ্নদশা ও উন্নয়নের উপায় নিয়ে ভাবলেও তাঁরা আবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমাজে অবস্থান করেন। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোকের সহযোগিতা নিতে হবে। এঁদেরকে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' সমাজের ভালো লোকগুলোকে একত্রিত করবে। তাদেরকে সমাজ উন্নয়নে কাজ করার জন্য

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে। এক্ষেত্রে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ ও ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে করণীয় করবে।

এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সফ্‌টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আবার কখনো রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ অব্যাহত রাখতে এবং বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ এবং ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

মোট কথা হলো, এ দেশে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন জনসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই, যাদের মানবিক মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। এতে শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সহগামী হবে। এজন্য দেশব্যাপী জন-সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’কে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমি মনে করি, এই বই নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষা ও সমাজ চিকিৎসার চমৎকার ব্যবস্থাপত্র।

ড. এম. সাদিকুল ইসলাম
অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ রচিত ‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ বইটি এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজসেবার একটি সময়োচিত জাতীয় রূপরেখা। বইটি পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বইটি সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবা প্রদানের একটি পরিকল্পিত পথরেখা– যে পথ অনুসরণ করলে এ দেশের জনগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে জনসম্পদে পরিণত হবে। তাঁর প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় ‘ফুল-টাইম স্কুলিং’-এর মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলী-সঞ্চারক শিক্ষার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে; আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি মডেল দেওয়া হয়েছে। দেশের শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখা এবং এ বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করার জন্য বেসরকারি পর্যায়ে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ নামে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম এবং দেশের সর্বত্র এলাকাভিত্তিক ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন করার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ফলপ্রসূ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে মানবসম্পদ তৈরিতে সফলকাম হতে পারেনি, যদিও শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়ে থাকে। আমি মনে করি, এই বইতে

প্রস্তাবিত শিক্ষা-সেবা মডেলের অনুসরণ শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজসেবার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করবে এবং এ দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করবে।

মো. মোশাররফ হোসেন
প্রেসিডেন্ট
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ রচিত 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' গ্রন্থটি আদ্যপ্রান্ত পড়েছি। লেখক তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় ধরে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। যার ফলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সামগ্রীক খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন, যা তাঁর লেখনীতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, সমাজগঠন, সমাজকর্ম ও সৃষ্টিসেবা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও কর্মের সাথে এসবের পূর্বাপর যোগসূত্র তৈরি করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি শিক্ষা ও সেবায়, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধি-বিধানের সাথে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও প্রায়োগিকতার মেলবন্ধন রচনা করেছেন।

এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করার জন্য তাঁর প্রণীত 'শিক্ষা-সেবা উন্নয়ন মডেল' একটি সময়োপযোগী সৃষ্টি। আশা করি, তাঁর এ উদ্যোগ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা যাবে, মানবসম্পদ তৈরি হবে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। তাঁর দেখানো এ পথ ও প্রচেষ্টা একটা সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে এবং তিনি এ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান
(বিসিএস শিক্ষা)
সাবেক অধ্যক্ষ
সরকারি রাশিদুজ্জোহা মহিলা কলেজ

কৃষি-প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে ফসলের পাশাপাশি আরও একটা জিনিসের বাম্পার ফলন সবার নজরে আসে, লেখাপড়ার মান যাই হোক না কেন জিপিএ ফাইভের বাম্পার ফলন সবকিছুকে আড়াল করে দেয়। সুনির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত সিলেবাস, তার থেকেও ভয়াবহ অভিশপ্ত সাজেশন, তার পরে আবার শর্ট সাজেশন, শেষ অবধি প্রশ্নপত্রই শিক্ষার্থীর হাতে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অভিজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। সাধারণ মানুষও খুব সহজে বলতে পারবেন, বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষার নামে একমাত্র সস্তায় সনদ বিলানো বাদে আর তেমন কিছুই হচ্ছে না।

শিশুশিক্ষার পাঠে আমরা পড়েছিলাম, 'বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু'। তারপরেও আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে মানবজীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অনেককিছু থাকলেও তার মধ্যে শিক্ষাই হলো প্রধান উপাদান। একটা বিষয় আমাদের মানতেই হবে– এ দেশে সুস্থ-সামাজিক বিকাশ নেই; সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ধস নেমেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বলতে কিছুই নেই। স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পেরিয়ে যাবার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চোখে পড়ার মতো উত্তরণ ঘটেনি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক শিক্ষা না থাকার কারণে আমরা বহির্বিশ্বের তুলনায় পিছিয়ে আছি। আজ প্রয়োজন আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যে ব্যবস্থাতে থাকবে কারিগরি, বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী হাতে-কলমে শিক্ষা। অন্তত সনদধারী মূর্খতার যুগের থেকে পরিত্রাণ পেতে এর বাইরে তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

আমি বিশ্বাস করি, 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' শীর্ষক বইতে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ (জাশিপ) গৃহীত রূপরেখা দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনগোষ্ঠী সুস্থ জাতীয় চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হবে, মানবসম্পদে রূপ নেবে। এ দেশের ধর্মভীরু জনগোষ্ঠী মানবকল্যাণে পথের দিশা পাবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। সর্বোপরি, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে ও সুষম উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরিতে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' একটা পথ বাতলে দিতে পারে। তবে এজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন শিক্ষা হয় জীবন ও কর্মমুখী বাস্তবতার নিরীখে।

ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম
অধ্যাপক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Book Review:
Name of the book: “Eso Shiksha-Sebar Sayabithitole”
Author: Professor Dr. Hasnan Ahmed

This book is a timely initiative by Dr. Hasnan Ahmed, a thinker and educationalist of the 21st Century. While reading this book, I am impressed with the implicitly and explicitly offered issues, proposals and guidelines. Although, it is a one hundred and thirty six page write-up ranging different educational and social issues, I couldn’t stop in the middle of reading. It was like I got into it. Every single issue raised on education was an exact mirror of my concern. How the outcomes of an application

oriented educational policy and reformation in education sector can bring immense changes in this sector have been clearly addressed and given the right direction as well in this book. Many educationist of 21st century share their proposals on the educational and social reformation in an implicit manner which fails to grab the attention of the competent authority. Throughout this journey, the author has shown the gut putting fingers in the eyes of the readers raising almost all the pragmatic agenda to essentially reshape our education and social sector and of how the every member of the society will benefit from the outcomes of education sector. Besides, the author has apparently raised issues which are the concerns of our Government and people as well. In doing so, the author has adequately addressed on and properly connected between education and social reality. In addition, the write-up reflects on the educational reformation with reference to social and national perspectives. The writer has offered a model on how religion and rational religious beliefs and practices can essentially contribute in the sectors of education and social service. The book has further moved on bridging the gap between human resources and sustainable economic development by connecting the dots proposed in this model. He has offered a very comprehensive, rational and implementable social model based on the proposed education and services. The book has finally addressed the prioritized areas to work on and benefit from the proposed education and social services model. Hence, I strongly urge our Government to take these proposals on priority basis and implement for the sustainable educational and social development in the near future. I wish the author and his book every success.

Dr. AKM Zakaria
Professor (English)
Head, Dept of HSS
DUET, Gazipur

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ লিখিত 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' বইটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। এটি তাঁর এক অনবদ্য রচনা। সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বইটিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনের বর্তমান বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। রচনাটি একজন প্রকৃত শিক্ষানুরাগী এবং দেশপ্রেমিকের দৈনন্দিন ভাবনার প্রতিচ্ছবি। দেশের স্বাধীনতার ৫১টি বছর পূর্ণ হয়েছে। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৭

কোটি। দেশটি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। শিক্ষাব্যবস্থার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জিপিএ ৫ পাবার সংখ্যাটা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নামও লিখিয়েছে। বর্তমানে দেশটির লক্ষ্য উন্নত বিশ্বের কাতারে নাম লেখানো। ড. আহমেদ এক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। আর এজন্য তিনি জীবনমুখী, কর্মমুখী এ নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। দেশে প্রতি মিনিটে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪.২ জন করে। তার মানে দেশে প্রতি বছরে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে ২২ লাখ নতুন শিশু। কিন্তু এই নতুন শিশুদের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। উল্টো প্রত্যেকটি শিশু ৬০ হাজার টাকা বাজেট ঘাটতি নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কর্মক্ষম জনশক্তি ১০ কোটি, যা মোট জনশক্তির ৬৬ শতাংশ। আর তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার ৭৪.৬৬ শতাংশ। কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষা না থাকায় এদের অর্ধেকই বেকার জীবন যাপন করছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, বাংলাদেশে মোট শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা চার কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার। দেশের ৪৭% স্নাতকই বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে। তারা সম্পদ না হয়ে দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ড. আহমেদ তাঁর পরিচিত রহমত মিয়ার পরিবারের কথা তুলে ধরেছেন। রহমত মিয়ার পরিবারের কেউ লেখাপড়া জানে না। নাতি ছেলে একজন আইএ পাস করেছিল। কিন্তু সে বাংলাটাও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। নাতিবউ ইসলামের ইতিহাসে এমএ পাস করেছেন। এই এমএ পাস করতে তার লেখাপড়ার তেমন প্রয়োজন হয়নি। প্রতিটি বিষয়ে পাঁচ-ছয়টা প্রশ্ন মুখস্ত করেই এমএ পাস করেছেন। মূলত বাংলাদেশের প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা প্রায় এমনই। স্কুল এবং কলেজগুলো প্রাইভেট টিউশনি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া বিদায় নিয়েছে। লেখাপড়ার জায়গায় স্থান পেয়েছে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জায়গায় স্থান পেয়েছে রাজনীতি। প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলোতে লেখাপড়া নেই বললেই চলে। শিক্ষার্থীরা সেখানে যায় উপবৃত্তি পাবার আশায়। জেলা-উপজেলায় শিক্ষা অফিস থাকলেও শিক্ষাব্যবস্থার তেমন কোন তদারকি নেই বললেই চলে। স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে পরিদর্শনে গেলে এক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণ সেজেগুজে আলতা-সাবান মেখেই স্কুলে যান। স্কুল মাদ্রাসার আঙ্গিনাকে পরিষ্কার করে রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে ব্যাপক। পরিদর্শকদের জন্য থাকে রসনা-বিলাসী খাবার। ব্যাস! ওখানেই পরিদর্শন শেষ! লেখাপড়ার প্রকৃত মান যাচাই সেখানে হয় না। এভাবেই চলছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা।

এমতাবস্থায় প্রফেসর আহমেদ তার রচনাতে সুশিক্ষা এবং বাস্তবসম্মত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মমুখী করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি দেশের স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সরেজমিনে অনেক স্কুল,

কলেজ এবং মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছেন। স্কুল, কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নুরানি, হিফজ ও কওমি মাদ্রাসা। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিশু লেখাপড়া করে। ড. আহমেদ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি পরিদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের ধর্মের প্রয়োগিক দিকের নিষ্ফল অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। মূলত এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ ইহকালবিমুখ এক ভ্রান্ত নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারা পরকালের শান্তির জন্য ইহকালের সকল কর্ম-ব্যবস্থাপনাকে এড়িয়ে চলেছেন। এটা যে ধর্মের নামে অধর্মের চর্চা হচ্ছে সেটিও তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার রচনাতে ধর্মের প্রায়োগিক অবস্থার কোরআনিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ড. আহমেদ বইটিতে মোট ছয়টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথমত তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতার দৈন্য তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি শিক্ষা ও সেবায় ধর্মের প্রয়োগগত বর্তমান ভুলগুলোর চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ধর্ম-কর্মের কোরানিক নির্দেশনার যথাযথ প্রায়োগিক অবস্থানের দিক তুলে ধরেছেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রচলিত ধার্মিকদের ধর্মব্যবহারের ভুল ধারণার অপনোদন ঘটিয়েছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিক্ষা, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর সর্বশেষ অধ্যায়ে তিনি শিক্ষা-সেবার নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ লক্ষ্যে শিক্ষা, সমাজ ও সম্পদ উন্নয়নে 'জাতীয় শিক্ষ-সেবা পরিষদ' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের সুপারিশ করেছেন। উপসংহারের মাধ্যমে তিনি তার রচনাটি সমাপ্ত করেছেন। আমি মনে করি, বইটি পাঠকের জন্য চিত্তাকর্ষক হবে। শিক্ষানুরাগীদের জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশপ্রেমিকদের জন্য অনবদ্য একটি রচনা হিসেবে পরিগণিত হবে। ধার্মিকদের জন্য এটি ধর্ম পালন বিষয়ক একটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। সামগ্রিক বিবেচনায়, শিক্ষা, সমাজ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বইটি একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে। তাঁর ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ ও ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ পরিচালনা করলে এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আমার মনে হয়েছে লেখক হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে অকপটে রচনাটি তৈরি করেছেন। তিনি একাধারে একজন লেখক, গবেষক, কলামিস্ট, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদ। আমি লেখকের আন্তরিকতাকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি, এ বইটি সচেতন মহলের বিবেককে জাগিয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান
দা’ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ড. হাসনান আহমেদ তাঁর ‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ নামক গ্রন্থে শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা তুলে ধরেছেন। বইটিতে স্থান পেয়েছে ছয়টি অধ্যায়। যেমন (ক) শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতা, (২) শিক্ষার সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত (৩) শিক্ষা ও সেবায় ধর্মের প্রায়োগিকতা ও ধর্ম-কর্ম (৪) মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা (৫) শিক্ষা-সেবা সমাজ ও (৬) শিক্ষা-সেবার নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম।

বর্তমান সমাজে শিক্ষার যে করুণ দশা তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বইটির পরতে পরতে। বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ, পত্র পত্রিকা ও মিডিয়ায় প্রাপ্ত সংবাদের বরাত দিয়ে দেখিয়েছেন আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল অবস্থা। আমাদের বিদ্যালয়গুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান– প্রতিষ্ঠানগুলোর যে হাল তা পুরো সমাজ অধঃপতনের প্রতিচ্ছবি।

বইটিতে আরও আলোচিত হয়েছে, মানুষের কিছু ভ্রান্ত ধারণা কিভাবে ধর্মকে সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিরত রেখেছে। ধর্মকে কিছু লেবাস আর অনুশাসনের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ধর্মের আসল রূপ এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে এর বৃহত্তর পরিধি– সেটি নিয়ে কোন চিন্তা, গবেষণা এবং প্রয়োগ হচ্ছে না বললেই চলে। ধর্মকে কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই আটকে রেখে এর বৃহত্তর কল্যাণকর দিকগুলো চাপিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে প্রকৃত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবানদের অবশ্যই কিছু করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আমরা লেখকের মতের সাথে পুরো একমত পোষণ করছি।

তিনি প্রশ্ন করেছেন জাতির উন্নয়নে মূলত কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো বেশি জরুরি। নিজেই উত্তর দিয়েছেন মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা। এটি তো আমাদের অনেকেরই মনের কথা। আমাদেরও প্রশ্ন, আমাদেরও একই উত্তর। উনি প্রকাশ করেছেন আমরা অনেকেই হয়তো প্রকাশ করছি না বা করতে পারছি না। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে? প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা কি সেই অর্থে গুরুত্ব পাচ্ছে? যদি পেয়েই থাকে তাহলে শিক্ষার এই হাল কেন? কেন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদান করার জন্য মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না, কেন মেধাবীরা অন্য পেশায় আকৃষ্ট হচ্ছেন। রাষ্ট্রের কি এখানে কিছুই করার নেই?

তিনি যথার্থই বলেছেন, ‘যে স্কুল পাশাপাশি দুই গ্রামের এমএ পাস বেকারগুলোর চাকরির সংস্থান করতে পারে না, সে স্কুল না হওয়াই ভালো। তাছাড়া স্কুলে পড়াতে আবার তেমন লেখাপড়া জানার দরকার হয় না-কি! স্কুল তো আর লেখাপড়ার জায়গা না। স্কুল টিউশনি করার জন্য ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের জায়গা। বাড়ি বসে এমপিও-ভুক্তির টাকা মাসে মাসে শান্তির সাথে খাবার জায়গা।’ এটিই কিন্তু আসল চিত্র। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষা, সমাজ ও মানবিকতা উন্নয়নে যে বৃহত্তর ভূমিকা রাখার কথা আমরা সেটি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উক্ত কথাগুলোর মধ্যে।

লেখক তাই শিক্ষায় সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শিক্ষা-সেবা সমাজ নামে একটি স্বশাসিত, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-

সংগঠন গড়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সমাজের মানুষকে জনে জনে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুশিক্ষা বেগবান করা, অভিভাবকদের বুঝিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠানো, স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-সচেতনতা ও উন্নত চিন্তাধারা আনয়নে নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা, সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে এই সংগঠনের কাজ। এই সংগঠনের প্রতিটি সদস্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অহিংস মনোভাবে বিশ্বাসী হবেন। প্রতিটি সদস্য সম্প্রদায়-সুহৃদ হবেন। প্রতিটি সদস্যের রাজনৈতিক দলের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন থাকতে পারে, তবে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবেন না। শিক্ষা-সেবা সমাজের সব কার্যক্রম ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে। প্রতিটি কাজের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শ ফুটে উঠতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের সাথে সংগঠনের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সাধারণ মানুষ সংগঠনের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করবে। চমৎকার প্রস্তাব!

তিনি আরও বলেছেন, চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন, প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে নৈতিকতা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, আর্ত-মানবতার সেবা, সততার ওপর আলাদাভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের অনুরোধ করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষকরা এদেরকে জীবনমুখী শিক্ষা যেমন– টয়লেট ব্যবহার, থুথু ফেলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নেশার পরিণতি, বড়দের সম্মান করা, সামাজিক লৌকিকতা, নম্রতা-ভদ্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, সময়ের মূল্য দেওয়া, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার, সচ্চরিত্র গঠন, শিক্ষিত পরিবেশ গঠন প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে ক্লাসে শেখাবেন। প্রকৃতপক্ষে মূল শিক্ষা কিন্তু এগুলোই। আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে অনেক উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ সার্টিফিকেটধারী লোকজন রয়েছেন, কিন্তু সমাজের অধঃপতন থেমে নেই। কারণ এই উচ্চশিক্ষিত লোকজনের ব্যতিক্রম ছাড়া অনেকের মধ্যেই সততা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা, মানুষের উপকার করার মানসিকতা, সচ্চরিত্রবান হওয়া এবং দেশকে ভালবাসার কোন উদাহরণ নেই। তাদের দ্বারা সমাজ উপকৃত হচ্ছে না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর গ্রেড পেয়ে শ্রেণির বৈতরণি পার হচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না নৈতিকতা, সহমর্মিতা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করাসহ বাস্তব গুণাবলি। তাই ভবিষ্যত বংশধরদের এসব আসল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে দেশ, সমাজ ও মানবিকতা উপকৃত হবে। লেখক সেই উদ্দেশ্যেই সমমনা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়তে চেয়েছেন যার প্রকাশ রয়েছে বইটিতে।

লেখক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর দেখানো উন্নয়নের পথে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনগোষ্ঠী সুষ্ঠু জাতীয়

চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হবে, মানবসম্পদে রূপ নেবে। এ দেশের ধর্মভীরু জনগোষ্ঠী মানবকল্যাণে পথের দিশা পাবে; অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। যে চাওয়াগুলো দেশের সর্বস্তরের মানুষের, একটি স্বাধীন দেশের জনসাধারণের। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, তেইশ বছরের ব্যবধানে দেশ পর পর দু-বার স্বাধীন হয়েছে। পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে, সেও পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে, জাতীয় জীবনে আমরা কতটা স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করছি। আমাদের নৈতিক উন্নয়ন কতটা হয়েছে। এই প্রশ্ন কিন্তু সচেতন সকল নাগরিকের। সচেতন সকল নাগরিকের মনের কথাগুলোই প্রফেসর হাসনান আহমেদ তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। প্রকাশ করেছেন কিভাবে তাঁর অন্দোলনে সমমনা ব্যক্তিবর্গ শরিক হতে পারেন। আমি তাঁর এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মাছুম বিল্লাহ
কান্ট্রি ডিরেক্টর- ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব)
এবং সভাপতি- ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইট্যাব)

এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

সূচিপত্র

১. শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতা ৫

২. শিক্ষার সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত ২৩

৩. শিক্ষা ও সেবায় ধর্মের প্রায়োগিকতা ও ধর্ম-কর্ম ৪৪

৪. মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ৬৯

৫. শিক্ষা-সেবা সমাজ ৮৪

৬. শিক্ষা-সেবার নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফরম ১০৫

এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

১.

শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতা

গত রাত থেকে মনটা বেশ বিষণ্ন। কয়েক দিন আগে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি গতকাল। রাতে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। আদৌ ঘুম আসছে না। বার বার অতীতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে– ছোটবেলা থেকে কলেজজীবন পর্যন্ত। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি করার ইচ্ছে ছিল। উদ্দেশ্য জনসেবা করা। নানাবিধ কারণে সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ছাত্রজীবন থেকে চাকরিজীবনের বারো বছর অবধি রোভার স্কাউটে সক্রিয় থেকেছি– সেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে নীরবে-নিভৃতে কিছু কাজ করেছি। ইতোমধ্যেই এ দেশের রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছি। রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবার ইচ্ছে শিকেই উঠেছে। এখন শুয়ে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে মিল খুঁজছি, দেখছি। দেশ নিয়ে মন থেকে যা চেয়েছিলাম, বাস্তবে দেখছি তার বিপরীত। যদি বলি, পেয়েছি যা তার আদৌ কিছু চাইনি, চেয়েছি যা নিজের করে পাইনি, কিছুই তার পাইনি। তেইশ বছরের ব্যবধানে দেশ পর পর দু-বার স্বাধীন হয়েছে। পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে, সেও পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। বুঝেছি, স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা এবং জাতির উৎকর্ষ সাধন বেশ প্রয়াসসাধ্য। আমি কি এতে সামান্যতম ভূমিকা রাখতে পারছি? এমনটি হলো কেন?

জাতির উন্নয়নে কোন কোন ফ্যাক্টর বেশি জরুরি? অনেক ফ্যাক্টরের মধ্যে মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষাকে আমি বেশি জরুরি ভাবতে শিখেছি। কীভাবে অর্জন করা সম্ভব? –এমন অনেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে নড়াচড়া করছে। চিন্তার ধারাবাহিকতা নেই। চিন্তাগুলো কেন জানি দিন দিন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বার বার তাল কেটে যাচ্ছে। দিনে দিনে জীবনের পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছে গেছি। মনের আকাশে মসিময় মেঘ। সহসা কাটবে বলে মনে হয় না।

গ্রামে জন্মেছি, বড় হয়েছি। আবার চাকরি জীবনের শুরু থেকেই এ দেশের অধিকাংশ জেলার গ্রামে-গঞ্জে বেশি বেশি ঘুরতে হয়েছিল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গবেষণা প্রজেক্টের কাজ নিয়ে। তাই গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ আমার চেনাজানা, দেশকে ভালোবাসার উৎসমুখ, মেলবন্ধন। সব কিছুই স্মৃতির পাতা

মেলে দেখছি আর ভাবছি। অগত্যা কলম নিয়ে বসলাম। একটা খাপছাড়া গোছের কবিতায় কিছু কথা মাথার মধ্যে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। লিখতে থাকলাম:

ফিরে যাই শেকড় যেখানে

ফিরে যাই শেকড় যেখানে–
যেখানে আমার নাড়ি পোতা আছে, আমার পূর্বসূরি, জ্ঞাতি ভাই-বোন বিজনে
শুয়ে আছে। আমার খেলার সাথী, শত্রু-মিত্র, পরমাত্মীয়, প্রতিবেশী,
আমার আকাশভরা একফালি স্মৃতিজাগানিয়া চাঁদ, এলাকাবাসী।
প্রাণের স্পন্দন সেখানে এখনো আছে, অবিরাম জীবন-খেলা সেই ভোররাত থেকে–
অগণন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ভাগবিমুখ মজুর-চাষি গায়ে ধুলোমাটি মেখে।
কথা ছিল আলোকবর্তিকা হবে, হবে সুশিক্ষিত, দেশসেবক, মানবসম্পদ,
বিলাবে সাম্যের বাণী; ন্যায়বিচার; পাবে মানবিক মর্যাদা; প্রাণভরা স্নেহাস্পদ।

সব আজ ধূলিধূসরিত পথে গেছে–
স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি কেজি-দরে বেচে খেয়েছে।
সুশিক্ষা নেই, সহানুভূতি নেই, দুঃস্থ সহায়তাও নেই, নেই কোনো স্বাস্থ্য-শিক্ষার কথা,
আছে প্যাঁচানো কথার মারপ্যাঁচ, কেওকেটা দুর্নীতিবাজ, দলীয় টাউট যথাতথা।
ওরা আজ বড্ড দুর্নমিত, যুগ যুগব্যাপী সুশিক্ষা-বঞ্চিত, তাই বিপথগামী–
জানে না শিষ্টাচার, অভাব সুষ্ঠু চিন্তাধারার; বোঝে না ভালো-মন্দ,
শুধু দলবাজি, নোংরামি।
আছে নেশার আখড়া, রামদা-কিরিচ, অপরাজনীতির বেসাতি, সর্বৈব মিথ্যাচার,
অন্তর্বিরোধ, কূটকৌশল, কুটনীতি, ধ্বংসের গতিময়তা, নির্ভেজাল অপপ্রচার
এই সুজলা-সুফলা সোনার বাংলাদেশে কে নিয়ে এলো!
শাশ্বত মূল্যবোধ, মানবতার বুলি, সাজানো স্বপ্ন, ভ্রাতৃত্ববোধ
সব যেন তছনছ হয়ে গেলো।
অশিক্ষা-কুশিক্ষা-প্রতিহিংসায় সমাজ-জীবন দুর্বিসহ, অমূল্য জীবন অনেকটাই নষ্ট,
সাথে নেতা-গুরুর পঙ্কিল দীক্ষামন্ত্র, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি–
ঘুটঘুটে অন্ধকার, তাই সুপথভ্রষ্ট।
আলোর বড় অভাব, সুকর্মের প্রশিক্ষণ নেই একেবারে, অথচ রয়েছে পেটের জ্বালা,
সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি দিনাতিপাত, ভবিষ্যৎ জীবন গড়ায় যথেচ্ছ অবহেলা।
ফিরে যাই সেখানে অহিংস মনে– সুশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সেবার ডালি নিয়ে জনে জনে,
গড়ে তুলি আরো নতুন সুদৃঢ় শেকড়– ভাবী অস্তিত্বের সন্ধানে।

(পল্লবী, ঢাকা: ২৫.১২.২০২১)

গ্রামের একজনের নাম মনে পড়লো। রহমতুল্লাহ (আল্লাহর রহমত) তার ডাক নাম হলেও গ্রামের প্রায় সবাই রহমত বলেই ডাকে। রহমতুল্লাহর নাতিদের অনেকের বয়স বিশোর্ধ্ব। কোনো কোনো নাতির ঘর জুড়ে সন্তানসন্ততি এসেছে। রহমতুল্লাহ আল্লাহর রহমতে এখনো বেঁচে আছেন। বয়স আশি ছুঁয়েছে আগেই, কোমর নুয়ে গেছে। এখন হাঁটা-চলা তেমন একটা করতে পারেন না। নিজের নামটাও স্বাক্ষর করতে পারেন না। সাদাসিধে চাষি মানুষ। তিনটা ছেলে। লেখাপড়া জানে না। বাপকে ডাকে বাজান (পুরো শব্দ বাপজান) বলে। বয়স কারো কারো ষাট পেরিয়েছে। জমিতে কাজ করেই দিন কেটে যাচ্ছে। জীবনের উন্নতি বলতে মাঠে জমি কেনাকে বোঝে; ঘরের মাটির দেওয়ালকে ভেঙে ইটের গাঁথুনিকে বোঝে। ছেলেদের প্রত্যেকেই রহমতের জমির ভাগের ভাগ পাঁচ বিঘে করে পেয়েছিল। রহমতের বাপও নিরক্ষর ছিলেন। রহমতের জন্য অংশমতো দশ বিঘে জমিও রেখে মরতে পারেননি। রহমত হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে ছেলেদের সহায়তায় জমি পনেরো বিঘে পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। তখন মাঠান জমির বাজার দাম ছিল কম। পরে জমির বাজার দাম বেড়েছে। তাছাড়া ভাইয়ে ভাইয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছেলেগুলো পৃথক হয়ে পড়ায় জমি বাড়েনি। বেড়েছে সন্তানসন্ততি। রহমতের নাতিরা মাঠ ভুলতে পারেনি। কেউ নিজের জমিতে, আবার কেউ পরের জমিতে কাজ করে। একটা নাতি আইএ পাস করেছে। পরীক্ষার ফলাফল ভালো না। পড়ার মান খারাপ। বাংলাটাও ভালোমতো উচ্চারণ করে পড়তে পারে না। প্রাথমিক গণিতের অবস্থা আরো খারাপ। অগত্যা বছরখানেক বাপ-ভাইদের সাথে মাঠে ছদ্ম-বেকার হয়ে কাজ করেছে। 'শিক্ষিত ছেলে' হয়ে মাঠের কাজ ভালো লাগেনি। সেজন্য গ্রামের পাশে গড়ে ওঠা বাজারে একটা মুদির দোকান দিয়েছে। এক বছর আগে দূরের এক গ্রামে বিয়ে করেছে। মেয়েটা এমএ পাস।

একদিন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হঠাৎ সেল ফোনটা বেজে উঠলো। ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, 'চাচা, ভালো আছেন? আমি রহমতুল্লাহ মণ্ডলের বেটার বউ। আমাকে চিনবেন না।' বললাম, 'হ্যাঁ, ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো? রহমত ভাই কেমন আছেন?' 'বাপজানের শরীরটা অতটা ভালো না। আমি উনার মেজো ছেলের বউ। আপনারা না-কি গ্রামে ইস্কুল বানাচ্ছেন? আমার বেটার বৌকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যায় না?' 'ও কী পাস?' 'শুনি তো এমএ পাস, আমি অত জানিনে। নেন, ওর সাথে একটু কথা বলেন।'

কথাবার্তায় যতটুকু বুঝলাম মেয়েটা ভদ্র। ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে এমএ পাস করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার নিকটবর্তী শহরের কলেজের মাধ্যমে অনার্সসহ এমএ পাস করতে রেজাল্ট পাওয়াসহ মোট সাত বছর লেগেছে। অঙ্ক,

ইংরেজি ও বিজ্ঞানের কোনোটাতেই দখল নেই বলে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে ভর্তির জন্য ফরম উঠিয়েছিল। এসএসসি ও এইচএসসির ফলও ভালো না। টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে যেতে পারতো। তাও যায়নি। ওতে সামাজিক কদর নেই, পাছে বিয়ে যদি না হয়। এমএ পাস সার্টিফিকেটের ইশারাকে ফেরাতে পারেনি। তাই কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। কোনো দিনই তেমন একটা লেখাপড়া করা লাগেনি। প্রতিটা পেপারের জন্য সাতটা প্রশ্নের নোট মুখস্থ করেই এমএ পর্যন্ত পাস হয়ে গেছে। প্রবলেম-সলভিং এবিলিটি নেই, এনালাইটিক্যাল এবিলিটি নেই, কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার উন্মেষ নেই, কমিউনিকেশন এবিলিটি নেই, ভাষার দক্ষতাও নেই, আছে শুধু ভদ্রতা। নোট বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন পরীক্ষার আগে মুখস্থ করেছিল, পরীক্ষা শেষে কয়েক দিনের মধ্যে আবার ভুলেছে। জীবন থেকে সাতটা বছর পার হয়ে গেছে। সাধারণ অঙ্ক ও ইংরেজি– ক্লাস টেন পর্যন্ত যতটুকু শিখেছিল তাও ভুলেছে। নোটগুলোও ঘরে রাখেনি। পরীক্ষার পরপরই কেজি দরে বেচে কটকটি ভাজা খেয়েছে। হাতে আছে কেবল সার্টিফিকেটগুলো। এই সার্টিফিকেটগুলো দেখিয়ে সে এখন চাকরি পেতে চায়। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, ‘দশম শ্রেণি পর্যন্ত সে বাংলা, অঙ্ক ও ইংরেজির মধ্যে কোনটা শেখাতে পারবে?’ সে নিরুত্তর। বললাম, ‘এমএ পরীক্ষা শেষ করে যদি তুমি গ্রামে থেকেও নকশিকাঁথা সেলাইয়ের তালিম নিতে, তবু আজ ভালো আয়-রোজগার করতে পারতে। এখন তুমি চাকরি পাবে কোথায়? তোমার বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক– কোনোটাতেই দখল নেই। তুমি শিক্ষকতায় গিয়ে কী করবে! তোমাকে শিক্ষকতায় দিলেই তুমি ক্লাসে নোট মুখস্থ করাবে, আবার পেট চলছে না অজুহাতে বাসায় ছাত্রছাত্রীদের টিউটর হিসেবে ইতিহাসের নোট পড়াবে।’ তাকে কোনো একটা ‘কর্মমুখী শিক্ষা’র দিকে যেতে পরামর্শ দিয়ে ফোনটা রেখে দিলাম।

কথাগুলো রহমত ভাইয়ের বংশধরদের যে কেউ শুনলেই আমার প্রতি নাখোশ হবে জানি। কিন্তু আমার তো এ বিষয়ে করার তেমন কিছু নেই। নোট মুখস্থ করা একজন শিক্ষক স্কুলে একবার নিয়োগ দিয়ে কমপক্ষে ত্রিশ বছর ধরে এলাকার সম্ভাবনাময় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে আদৌ আমার নেই। অসুবিধাটা ওদের বোঝাবে কে! স্পিল-ওভার ইফেক্ট তো ওদের বোঝার কথা না। আর এদের মধ্য থেকে শিক্ষকতায় আগ্রহ আছে, দায়িত্ব বোধ আছে এমন কাউকে-না-কাউকে বেছে না নিলেও স্কুল চলে না। এলাকায় গিয়ে কয়েকটা ফোন দিলেই এমনই দশ-বিশটা কলেজ-পড়া এমএ পাস সার্টিফিকেটধারী বেকার এসে ভিড় করে। ওদের মুখের দিকে তাকালেও মমতা লাগে। ওদের তো কোনো দোষ নেই। ওরা পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার।

ওদেরও একই দশা। ক্লাস টেন পর্যন্ত অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান পড়াতে পারে এমন শিক্ষক খুঁজছি, পাচ্ছিনে। যারা চাকরির জন্য আসছে তাদের দিয়ে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানোর কাজ প্রয়োজনমতো হবে না বলেই ধরে নিয়েছি। অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান পড়াতে পারে এমন কিছু ছেলেমেয়ে আছে। তারা এতো কম বেতনে আসতে চাচ্ছে না। অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে অন্য কোনো চাকরিতে চলে যাচ্ছে। এভাবে অনেককে ‘না’ শব্দটা বলে বিদায় দেওয়াতে অনেক পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছি। তারা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। উভয় সঙ্কট অবস্থা। তাদের কথারও যুক্তি আছে। ‘যে স্কুল পাশাপাশি দুই গ্রামের এমএ পাস বেকারগুলোর চাকরির সংস্থান করতে পারে না, সে স্কুল না হওয়াই ভালো।’ ‘তাছাড়া স্কুলে পড়াতে আবার তেমন লেখাপড়া জানার দরকার হয় না-কি! স্কুল তো আর লেখাপড়ার জায়গা না। স্কুল টিউশনি করার জন্য ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের জায়গা। বাড়ি বসে এমপিও-ভুক্তির টাকা মাসে মাসে শান্তির সাথে খাবার জায়গা।’

সমাজের চিন্তা-ভাবনাটাই পুরো বদল হয়ে গেছে। অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শেখার কাজ কতটুকু হবে– এ নিয়ে কারো কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। না শিখতে পারলে ক্ষতি কার হবে– এটা নিয়েও ভেবে দেখা নেই। কে কার আগে নতুন স্কুলে লোক ঢোকাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা। অনেকে আবার শিক্ষকপ্রতি পাঁচ-সাত লাখ টাকা দিতেও প্রস্তুত। আবার নিয়োগ দিতে গেলে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর এ মনোভাব হবেই না-বা কেন? কয়েক মাইল দূরে একটা কলেজ তো এভাবেই হলো। শিক্ষকপ্রতি কমপক্ষে আট লাখ টাকা করে অনুদানের নামে নিয়ে পনেরো জন কলেজ-শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারলে টাকা আসে কোটি টাকার ওপরে। টাকাটা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে সুদের টাকায় বেতন চলে। টাকাওয়ালা বেকারদেরও একটা সদ্‌গতি হয়। কলেজে লেখাপড়া কেমন হবে– ওটা কোনো বিবেচনার বিষয় না। একজন জমি দিয়ে কলেজ করেছে, সমাজে নামটা তো হবে। কিছু বেকারের চাকরি তো হবে। মানসম্মত শিক্ষার ব্যাপারে গঙ্গামুখো পা। ও নিয়ে ভাবনা সমাজ থেকে উঠে গেছে। উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে সমাজের ভাবনা উঠে গেছে মানেই আমার ভাবনা বেড়েছে।

আমাদের পাশাপাশি দুটো গ্রামে আগ থেকেই দুটো সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে। অন্যান্য গ্রামেও আছে। ওখানে তো আশপাশ গ্রামের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে বাড়িতে বসে কত শান্তির সাথেই-না স্কুলে হাজিরা দিয়েই মাসে মাসে টাকা আয়-রোজগার করে খাচ্ছে। সে-সাথে প্রাইভেট-টিউশনির রমরমা শিক্ষাব্যবসা জমেছে। স্কুলের খাতায় নামটা রাখতে পারলেই হলো। বাড়ির কাজ, সংসার,

মাঠঘাট দেখার পাশাপাশি প্রতি মাসে একটা বাড়তি রোজগার। এই দুর্মূল্যের বাজারে বাড়তি যা আসে, মন্দ কি! ওখান থেকে কমপক্ষে ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষার আলো (?) বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্কুলে কোনো শিক্ষা শেখানো হয় না। ছাত্রছাত্রীরা শেখে স্কুলে যাওয়া ও আসা। অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাচ্ছে উপবৃত্তি পাবার আশায়। ক্লাস ফোর/ফাইভে পড়ছে, এখনো অক্ষর চেনে না, উচ্চারণ করে পড়তে পারে না। কয়েক ক্লাস যেতে-না-যেতেই ঝরে যাচ্ছে। কয়েক বছর পেরোলেই এরা লেখা ও পড়া ভুলে যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে কলম কাঁপাতে কাঁপাতে স্বাক্ষরতা। এ দেশের পরিসংখ্যান বিভাগের কাছে এদের মূল্য অনেক। অন্তত স্বাক্ষরতা হারের গণনায় আনতে পেরে এরা বেজায় খুশি। অগণন ছেলেমেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা জীবনভর অধরাই রয়ে যায়। অন্য অনেক দেশ দেখেছি। স্কুলের বাচ্চাদের শেখানোর জন্য কত চেষ্টাই-না শিক্ষক-শিক্ষিকারা করেন! আমরাও তো আমাদের সময়ে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি। শিক্ষকরা যথেষ্ট যত্ন নিতেন; শেখাতেন। প্রয়োজনে অভিভাবককে তলব করতেন। সে মনোভাব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে! ছাত্রছাত্রীদের শেখানো নিয়ে শিক্ষকদের যেন কোনো দায়িত্ববোধই নেই! এমনটি হলো কেন? হয়তো আমরা স্বাধীনতার আস্বাদন করছি, তাই। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই অগণিত যুবক-যুবতীর প্রত্যেকের উর্বর একটা মাথা ও এক-জোড়া কর্মঠ হাত পঙ্গু করে দিলো কেন? এরা কি সরকারি বা এমপিওভুক্ত চাকরিতে গিয়ে আরো বেশি দায়িত্বশীল হয়ে বেশি বেশি কাজ করতে পারতো না? এরা কি জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নিতে পারতো না? শিক্ষার মাধ্যমে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারলে ক্ষতি কী ছিল? মুখস্থ করে নামসর্বস্ব এমএ পাস না করে এরা কি মেধা খাটিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে প্রত্যেকেই অন্তত দু-একজন অল্পশিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান করতে পারতো না? সে পরিবেশ কি আমাদের দেশে আছে? সে ধরনের শিক্ষা ও প্রচেষ্টা কি আমাদের সমাজে আছে? একজন সৎ ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তা হতে পারলে, সেখানে অন্তত বিশজন লোকের কর্মসংস্থান করতে পারলে সেটা কি ইসলামের ইতিহাসে এমএ পাস করে সওয়াব অর্জনের তুলনায় কম ইবাদতের কাজ হতো?

একটু বলে রাখি। আমরা অবশ্য গ্রামে আর স্কুল তৈরি করতে চাচ্ছিনে। পাশাপাশি দুই গ্রামে দুটো স্কুল আগে থেকেই আছে। এটাকে কেউ বলে মাদ্রাসা। আমরা তাও তৈরি করতে চাচ্ছিনে। বাদুরের মতো– পাখিও না, আবার পশুও না। তবে কী? দুটো মিলিয়ে একটা কিছু। না ঝোল, না চচ্চড়ি মতো। চেয়েছি, আরবিটা ভালো পড়তে ও বুঝতে পারবে, বলতেও পারবে; কুরআন ও হাদিস শিখবে। অর্থাৎ ইসলামি বুনিয়াদ থাকবে। আরবিতে কথা বলার চর্চা করাতে হবে। প্রয়োজনে

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়ে একটা টেকনিক্যাল কাজও করতে পারবে। 'ফুল-টাইম স্কুলিং'-এর ব্যবস্থা করে সাথে আরো শিখতে হবে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান; সে-সাথে জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা; তৈরি করতে হবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ভাবুক মন। ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ। সার্টিফিকেটটা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকেই দেওয়া হবে। পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা উঠে যাওয়াতে আমাদের প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল হবে বলে আশাবাদী। এ ধরনের নতুন কিছু করতে চাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক মতামত, অনেক আপত্তি। রোষানল, ফতোয়া জারি। পাশাপাশি দুই গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরা, তাদের আপনজন তো উঠে-পড়ে লেগেছে আমাদের এই মাদ্রাসা নামের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এতে তাদের টিউশনি কমে যাচ্ছে। এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, যেমন– এতিমখানা, হেফজখানা, টেকনিক্যাল স্কুল, কমিউনিটি ট্রেইনিং সেন্টার, কমিউনিটি লাইব্রেরি, স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক, অভাবী-দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা কেন্দ্র।

অনেক উন্নত পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমস্যা একটাই। এসব কাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজে লোকের অভাব। অবশ্য দিনে দিনে অনেকেই বুঝছে, এগিয়ে আসছে। দেখা যাক, কোথাকার পানি কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। ভালো কাজের বিরোধিতা অনেক। পুরোপুরি গড়তে না পারা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। স্রোতের প্রতিকূলে ভালো কিছু করা সত্যিই কঠিন। শিক্ষার আলো যেখানে নেই সেখানে আরো কঠিন। কথায় আছে, অশিক্ষিত, না-বুঝ লোকের শতেক দোষ। আরো অসুবিধে– যদি সাথে গ্রাম্য পলিটিক্স, দলাদলি, কুটিল বুদ্ধি, ল্যাং মারামারি থাকে। কথায় আরো আছে, 'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে'। বাস্তবে তা না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পলিটিক্স, কুটিল বুদ্ধি থাকলে অনেকেই সাধারণ মানুষের ভালো, জীবনের উন্নতি আসলেই বুঝতে চায় না। কিছু স্বার্থপর-দলবাজ লোক বর্তমান সমাজে সাধারণ মানুষকে ভালো কিছু বুঝতে দেয় না। ভুল বুঝিয়ে ভালো কিছু পণ্ড করে দিতে চায়। এটা সামাজিক কুশিক্ষার পর্যায়ে পড়ে। প্রকাশ্যে গালি দিয়ে বলে, "আমি লেখাপড়া শিখি, আর না-শিখি; গণ্ড মূর্খ হই, আর না-হই; খাটে শুয়ে পা পুব দিকে দিই, না পশ্চিম দিকে দিই– তুমি তা দেখার কে হে? তুমি ঢাকায় থাকো, সেখানে কিছু করো। গ্রামে উড়ে এসে জুড়ে বসবে কেন? আমরা গ্রামে 'মহান পলিটিক্স' করতে শিখেছি। তুমি আগামী 'ইলিকশনে খারাইবা' নাকি? তাহলে আমাকে সাথে নাও, 'মাল-পানি' ছাড়ো। নইলে এদিকে এলে ঠ্যাঙের গোছা লাঠি মেরে ভেঙে দেবো।" এ দেশের মহান রাজনীতিবিদরা গ্রামে-গঞ্জে তাদের সহযোগীদের মুখে দীর্ঘ বছর ধরে সুমিষ্ট রসদের বোতল ফিডারের মতো উপুড় করে ধরে রেখেছে। তারা সেটা চুষে চুষে

খেয়ে নিজেদের পুষ্ট করছে; চরিত্রও নষ্ট করে ফেলেছে। এ দেশের সমস্ত নষ্টের জননী তো এই 'মহান রাজনীতির স্পর্শ'। গ্রামের সহজ-সরল সাবলীল পরিবেশ একেবারে নষ্ট করে ছেড়েছে। গ্রাম এলাকার এই উন্নয়নে আমার মতো একজন নগণ্য মাস্টার সাহেব অঢেল 'মাল-পানি' পাবেটা কোথায়? আমি পরিকল্পনা দিচ্ছি, অর্থসংস্থানের পথ বাতলে দিচ্ছি, সহযোগিতা দিচ্ছি, পথনির্দেশনা দিচ্ছি– এটা নিয়েই সামনে এগোই না কেন? সামাজিক উন্নয়নের জন্য এটাই তো যথেষ্ট। আশার কথা এই যে, সাধারণ মানুষ একটু দেরীতে হলেও তাদের ভালো বুঝতে পেরেছে। এখন অনেকেই এসে পাশে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

রহমতুল্লাহর বংশধরদের মধ্যে ইদানীং দুজন লেখাপড়া শিখেছে। একজন মুদির দোকানি, অন্যজন ইতিহাসের নোট মুখস্থকারী বেকার। রহমতুল্লাহর জীবন থেকে আশিটা বছর পেরিয়ে গেছে। বংশধরদের পেশার বহুমুখিতা নেই। না আছে জীবন পরিচালনা করার মতো, জীবনকে বোঝার মতো গভীর ভাবনা, পর্যাপ্ত জ্ঞান, উপযুক্ত শিক্ষা।

অশীতিপর রহমতুল্লাহর মৃত্যু-পালে বাতাস লেগেছে, এ দেশের স্বাধীনতার অর্ধশতবার্ষিকী ধুমধামের সাথে পালিতও হয়েছে; কিন্তু রহমতুল্লাহর মুমুক্ষু ওয়ারিশগণের আত্মোন্নয়ন ও শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোনো পরিবর্তন আমি লক্ষ করিনি। অজ্ঞতা এদের জীবনসঙ্গী। এরা জীবনের অর্থ বোঝেনি। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা কায়িক শ্রম দিয়ে শুধু দু বেলা পেটের ভাত জোগাড় করাটাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ঠাওর করেছে। আর হালনাগাদ জরাগ্রস্ত-নষ্ট-দিগ্‌ভ্রষ্ট দেশীয় রাজনীতির বিষবাষ্পে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিনীত-রাজনৈতিক শক্তির সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এভাবেই মগডালের সুখপাখিকে আঁকড়ে ধরার সুখদ স্বপ্ন দেখেছে। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সীমিত চিন্তার গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেছে কিংবা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টা করেনি বা চেষ্টার চিন্তাই মাথায় আসেনি বা পরিবেশ তাকে বঞ্চিত করেছে। ভাগ্যকে দোষারোপ করে প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে।

পারিবারিক ও সামাজিকভাবে রহমতুল্লাহ ও তার বংশধরেরা ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির। ধর্মকর্মও যতটুটু পারে করে। শিক্ষা না থাকলে ধর্মের সহজ-সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকাটাও কঠিন। জীবনের ভালো-মন্দ বোঝা আরো কঠিন। মাথা ঝাঁকানে পির, নাচুনে পির, কবর পূজক তত্ত্ব, বোমাবাজি তত্ত্ব, ধর্মীয় উগ্রবাদ, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি প্রাধান্য বিস্তার করে। ধর্মের মূল লক্ষ্য কী এবং কেন দরকার– তা জানা যায় না। নানান কুসংস্কার, কুচিন্তা এসে মাথায় ভর করে। 'সরল-সঠিক'

পথের সন্ধান মেলে না। চলা ও ভাবনার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। সমাজে 'মূর্খ' লোক বলে পরিচিতি পায়। অজ্ঞানতার নানান দোষে দুষ্ট হয়। পারিবারিক পরিবেশ অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও নিম্নতায় ভরে যায়। এসবই রহমতুল্লাহ ও তার বংশধরদের মধ্যে আছে। রহমতুল্লাহর বংশধরদের জীবনযাপন প্রভাব সমস্ত সমাজব্যবস্থায় পড়েছে।

বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের মাধ্যমে, পেপার-পত্রিকা পড়ে সারা দেশের শিক্ষা, শিক্ষার দশা ও সামাজিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি ও জেনেছি। সব জায়গার অবস্থা কমবেশি একই রকম।

রহমতুল্লাহর চিন্তা-ভাবনার পরিণতি ভাবলে আমার কষ্ট হয়। রহমতুল্লাহ নিজে বোঝে না সত্য, কিন্তু সমাজের কেউ না কেউ যদি তাকে শিক্ষার সুফল ও উন্নত জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলে ছেলে-মেয়েগুলোকে অন্তত লেখাপড়া শেখানোর জন্য পথ দেখাতো, শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নিয়মিত কাউন্সেলিং করতো, নিয়মিত জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দিতো, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তাহলে তাকে কিংবা তার বংশধরদেরকে এভাবে বংশপরম্পরায় নিরক্ষর, অজ্ঞ বা অশিক্ষিত থাকতে হতো না। এদেশের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কী? তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করছে? তারা তাদের মূল দায়িত্ব থেকে যোজন যোজন দূরে সরে চলে গেছে। আমরা উন্নয়নের রূপরেখা গড়তে ব্যক্তিকে (ব্যষ্টিক) টার্গেট করে কাজে নামছিনে কেন? ব্যষ্টিক উন্নয়নের যোগফলই তো সামষ্টিক উন্নয়ন। তাহলে দেশও রহমত গংকে নিয়ে অনেক আগেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেত। এই একটা বংশপরম্পরার মধ্যেই এ দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেক ভাবনা-চিন্তা, মনোবিজ্ঞান, উন্নয়নের রূপরেখা, জীবনদর্শন, বঞ্চনা ও কালের কথা লুকিয়ে আছে।

মানুষ আছে বলেই দেশ; মানুষ রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক উপাদানের অন্যতম। মানুষের জন্য দেশ। মানুষই মানুষের জন্য দেশ গড়ে। মানুষই সর্বেসর্বা। আমি বলি উন্নয়ন মানে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততা। উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী উন্নত সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে। এ কথা কোনো কোনো বইতে খোলাসা করে লিখেছিও। মানসিকতার এই উন্নতি ঘটাতে পারে একমাত্র সুশিক্ষা, উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা। সুশিক্ষা উন্নত সমাজ গড়ার জন্য মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আবার শিক্ষা মানেও শুধু লেখা, পড়া ও অঙ্ক জানাকে বোঝাবে না। এ তিনটি ছাড়াও শিক্ষায় মনের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুসন্ধানী মনোভাব ও সৃষ্টিশীলতা, মানবিকতা, সততা, জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ, দেশপ্রেম এবং ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জেগে উঠতে

হবে। এই গুণগুলোর সূচক যত ওপরের দিকে যাবে, সে জনগোষ্ঠী তত শিক্ষিত। আমার দৃষ্টিতে দেশের উন্নয়ন মানে দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মানবসম্পদকে অনুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। যদি মানবসম্পদকে মানব–আপদ বানিয়ে উন্নয়নের চেষ্টা করাও হয়, সে উন্নয়ন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দুঃশাসন ও দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে ভরা– তা আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়ন দেখা গেলেও সে উন্নয়ন সাময়িক, হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো, ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুনের মতো– সকাল হতে না হতেই চুপসে যায়, টেকসই উন্নয়ন হয় না। প্রচুর সম্পদের অপচয় হয়। এজন্য হাল-ঢালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো একদল ভালো শিক্ষকও যদি ওপরে-বলা গুণগুলো বাদে শিক্ষার নামে জনগোষ্ঠীর মাথার চুল ধরে ওপরের দিকে টানে, আর মুখসর্বস্ব রাজনৈতিক অসুরশক্তি যদি সামাজিক সুশিক্ষার পুরো অবয়ব ধরে নীচের দিকে টানে, তাহলে জনগোষ্ঠী আজ হোক আর কাল হোক অন্ধকারের অতলে নিপতিত হতে বাধ্য। কালক্রমে এ জাতি অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর গোলামে পরিণত হতেও বাধ্য। তাই-ই বাস্তবে হচ্ছে। আমাদের সবারই দূরদর্শী লেন্সওয়ালা চশমা দরকার। লেখা ও পড়া জানা লোকজন কোনো না কোনো রাজনীতির লাভজনক লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে সততা, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের মাথা খেয়ে শতেক কৌশলে দেশ শোষণ, লুটপাট অব্যাহত রেখেছে। সেজন্য লেখাপড়া জানা লোকদের শিক্ষিত লোক বলে নামাঙ্কিত করতে মতিভ্রম হচ্ছে। যে কথার কোনো বিকল্প নেই, তা হলো দেশকে উন্নত করতে গেলে, দেশটা ভালো চলতে গেলে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সৎ, নীতিবান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত জনসম্পদ (জন-আপদ নয়) সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পদে কর্মরত থাকতে হবে। কোনো একক ব্যক্তি, সে যত সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত, সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া, সমৃদ্ধ জাতি, উন্নত সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে পারে না।

আমি বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ সমাজে গেছি, প্রতিটি পরিবারকে কাছ থেকে পরখ করে দেখেছি। হয়তো দাদা লেখাপড়া করেনি, আবার তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর সময় আসতে কমপক্ষে পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। নাতি-নাতনী ও তাদের অভিভাবক যদি আবার লেখাপড়া উদাসী হয়, তাদেরও লেখাপড়া হয় না। তাদের পরবর্তী পুরুষ আসতে আবারো পঁচিশ বছর পেরিয়ে যায়। তাদেরও যদি লেখাপড়ায় আগ্রহ না থাকে তাহলে দাদা থেকে নাতি পর্যন্ত বা তার ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত ষাট বছর পেরিয়ে যায় নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি

পেতে। এভাবেই কিন্তু এ দেশের শিক্ষা বংশপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত অধরা রয়ে যাচ্ছে। পরিবারের কেউ কেউ কপালগুণে লেখাপড়া শিখে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। অনেকেই প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই ঝরে যাচ্ছে। আর লেখাপড়া তো শুধু স্কুলে আসা-যাওয়া করলেই হয় না। বাপ-মার আগ্রহ ও সচেতনতা এবং উপযুক্ত পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। তাই আমরা পরিবারকে শিক্ষার প্রথম ধাপ বলে গণ্য করি। এছাড়া আমরা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশও দিতে পারছিনে। বই থেকে শেখায় এক কথা, বাইরের পরিবেশ থেকে শেখে উল্টোটা। খেলাপাগল অবুঝ বাচ্চারা জীবনের উন্নতির কিই-বা এমন বোঝে! একটুতে একটু হলেই কুঁড়িতেই ঝরে যায়। উঠতি বয়সে বিপথে যায়। ভবিষ্যতে নিজেই যখন নিজের অপারগতার কথা বোঝে, তখন আর ফেরার পথ থাকে না। এভাবে পর পর তিনটা পুরুষ আত্মসচেতনতার অভাবে লেখাপড়া হয়নি আবার মাঝখান থেকে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে– এমন অনেক পরিবারকেই আমি দেখেছি। এ জন্যই স্বাক্ষরতার হার এ দেশে তেমন একটা বাড়ছে না। জোড়া-তালি দিয়ে খাতা-কলমে যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্যেও অতিরঞ্জিত আছে বলে জানি। আবার স্বাক্ষরতার হার একটু বাড়লেও শিক্ষার হার নিম্নমুখী। এভাবে শিক্ষার হারকে স্বাক্ষরতার হার দিয়ে আর কতদিন চলবে! আবার সমাজে শিক্ষার হার বললে স্বাক্ষরতার হার ও শিক্ষার হারের পার্থক্য আকাশ-পাতাল হয়ে যায়। মূলত কলম কাঁপাতে কাঁপাতে নামের বানানটা কোনোভাবে এলোমেলো বসাতে পারলেই তাকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাতারে নাম না লেখানোই ভালো। অথচ আমরা তা করি। আমরা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যকে জীবন পরিচালনার জন্য শিক্ষা না ভেবে চাকরি পাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছি। অথচ চাকরি পেতে লেখাপড়ার সাথে প্রয়োজনীয় সফট স্কিলস না শিখে শুধু সাধারণ লেখাপড়া শিখে চাকরির বাজারে ভিড় জমায়। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ে। দরকার কারো প্রকৃতিপ্রদত্ত অবস্থান থেকে শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তার উৎকর্ষ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই মানসিকতার ও চিন্তা-চেতনার উন্নতির নামই শিক্ষা। উন্নত সমাজ গঠনে এই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। লেখাপড়া দিয়ে শিক্ষা অর্জনের সূচনা। শিক্ষা মানে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই একটা সাধারণ প্রস্তুতি। সেজন্যই জীবন শেষে অবসর জীবনে শিক্ষা না দিয়ে জীবনের শুরুতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা জীবনভর থাকা দরকার। শিক্ষা দরকার সুস্থ মানসিকতা দিয়ে জীবনের ও সৃষ্টির মঙ্গল-অমঙ্গল বোঝা, ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারা, নিজেকে ভালো পথে পরিচালিত করা, প্রগতিশীল সমাজ গড়া

ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। দেশে যদি প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি না করা যায়, তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মুখসর্বস্ব বিজ্ঞাপিত উন্নয়ন কোনো দিনই টেকসই উন্নয়ন হয় না। তা অল্প সময়ের ব্যবধানে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার শামিল।

এবার বেশ কিছুদিন পর গ্রামে গেলাম। করোনার কারণে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে স্কুল খুলেছে। ইচ্ছে করেই বেশ কয়েকটা প্রাইমারি স্কুলে গেলাম। আমি যে স্কুলে লেখাপড়া করেছি সেখানেও গেলাম। প্রায় প্রতি গ্রামেই সরকারি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। যত গোল পাকালো এই 'সরকারি' (ব্যতিক্রম বাদে, ব্যতিক্রম তো কোনো ক্রম নয়) শব্দটা নিয়ে। সরকারি সেবা দিতে চায়ই-বা কে! শিক্ষকরা তো আর মানুষ থাকে না, সরকারি লোক হয়ে যায়। কাজ ও বেতনের চিন্তামুক্ত নিরাপত্তা পায়। দায়িত্বও সরকারি দায়িত্ব। 'সরকারি মাল, দরিয়ামে ঢাল' দেখা দেয়। সরকারি স্কুলের ঘরে কোনো পাখি এসে বাসা বাঁধলে সেটাও বাসায় বসে সরকারি সুবিধা ভোগ করার ধান্দায় থাকে, সরকারি পাখি হয়ে যায়। মানসিকতা বদল হয়ে যায়। উড়ে গিয়ে আধার সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। ভাবে সরকার এসে দিয়ে যাবে। এগুলোও শিক্ষা ও দায়িত্ববোধের অভাব। সেজন্য সবাই সরকারি ও এমপিওভুক্তির খাতায় নিজের নামটা যে-ভাবেই হোক লেখাতে চায়। দায়িত্ববোধের কোনো বালাই নেই, কর্মোদ্যম নেই, শুধু বসে বসে সময় পার করার চেষ্টা। সময়ের অনিবার স্রোতে জীবন ও কর্মকে নগণ্য করে কাগজের নৌকার মতো ভাসিয়ে দেওয়া। এটা এ দেশের প্রতিষ্ঠিত হাবভাব, নিয়ম, সংস্কৃতি। এই সরকারি মনোভাব ও অবস্থার স্রোতে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই নিশ্চেষ্ট মনোভাবের ধাক্কা স্কুলগুলো ও ছাত্রছাত্রীরা সামলাচ্ছে। শিক্ষকদের কোনো জবাবদিহি নেই। জেলা-উপজেলার কর্মকর্তারা কখনো-সখনো স্কুল ও শিক্ষকদের দেখতে আসেন। শিক্ষার অবস্থা তো আর দেখতে আসেন না। শিক্ষক ও কর্মকর্তার চাকরি অব্যাহত থাকে। দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর, বছর গড়িয়ে যুগ। এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলছে। এভাবে চলে চলে গা সওয়া হয়ে গেছে। অনিয়মই নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজে একবার যদি কোনো একটা অনিয়ম চলে আসে, সেটাকে সাথে সাথে মূলোৎপাটন না করতে পারলে আরো ডালপালা মেলে ক্রমশই প্রসার লাভ করে। অনিয়মের মূল বৃহত্তর সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসা অতটা সহজ নয়। স্কুলে জীবনশিক্ষা (যেমন– টয়লেট ব্যবহার করতে শেখানো, থুতু ফেলতে শেখানো, বড়দের সম্মান করতে শেখানো, সত্য বলতে শেখানো) নেই। পঞ্চম শ্রেণির খুব কম ছাত্রছাত্রীই উচ্চারণ করে বাংলা বইটা

পড়তে পারে। যোগ-বিয়োগ জানে না। হাতে গুনে যে ক জন জানে, তা জানে তাদের সচেতন বাপ-মায়ের কারণে। বাপ-মাদের বাড়িতে নিজে অথবা আলাদা টিউটর রেখে ছেলেমেয়েকে পড়ার তালিম দিতে হয়। কোনো বাপ-মা স্কুলে এসে লেখাপড়ার এ দুরবস্থার কথা কোনো শিক্ষককে কোনো দিন জিজ্ঞেস করে না। তাদের মন থেকেও স্কুলে পড়া ও পড়ানোর গুরুত্ব কমে গেছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা শুধু আসে এবং যায়। পরীক্ষা দিতে হলে স্কুলে আসতে হয়। উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য আসতে হয়। অভিভাবকমহলের অনেকেই অসচেতন, অজ্ঞ। উপবৃত্তির টাকা হাতে পেয়েই খুব খুশি। গ্রামে দেখলাম, সাধারণ মানুষ নিজের ভালো বোঝে না। গ্রামে এখন রাজনীতি আসাতে অশিক্ষিত লোকের চোখ-মুখ খুলে গেছে। প্যাঁচানো কথার দাপট বেড়েছে। সুস্থ চিন্তার বিকাশ নেই। কুটিলতা-দলবাজি, গ্রুপিং পদে পদে। শুধু নগদটাই বোঝে, ভবিষ্যৎটাকে একেবারেই বুঝতে চায় না। ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে যে পাঁচটা মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেল অথবা পঞ্চম শ্রেণি শেষেই ঝরে গেল– সে ভাবনা বেখবর। তাদের নিদেন বুঝ, মুখস্থ কথা, ‘লেখাপড়া শিখে দেশে চাকরি-বাকরি আছে না-কি! স্কুলে গেলে মাসে মাসে উপবৃত্তির টাকাটা তো পাওয়া যাচ্ছে। এটাই-বা মন্দ কি!’ অর্থাৎ অভিভাবকমহলেরও উচ্চ চিন্তা ও শিক্ষার অভাব। কোনো নেতা-নেত্রীর ঢালাও সাদামাটা আহ্বানে এ সঙ্গিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। এজন্য জনে জনে তদারকি দরকার। যারা তদারকি করবেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুশিক্ষিত সমাজ গঠনের অনুকূলে হওয়া দরকার। সুস্থ চিন্তার বিকাশ সাধন দরকার। তারা সুশিক্ষিত হওয়া দরকার।

এসব কথা লিখছি বলে আমার দিকে হেই হেই করে তেড়ে আসার দরকার নেই। দু-চোখ মেলে পলক না ফেলে দেখুন। ঠিকই বাস্তবতা চোখে ধরা পড়বে। এবার সমাধানের চেষ্টা করুন।

আমার কাছে যেটা সবচেয়ে খারাপ লাগলো, অগণিত ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কিছুই শিখছে না। বাংলা বইটাও ভালো করে পড়তে পারে না। বলার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। আমরা যেহেতু স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো নিয়েই বড় বড় বক্তৃতা দিতে থাকি, তা হচ্ছে। তারপর বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির আগেই ঝরে যাচ্ছে। আবার হাইস্কুলে গেলেও সেখানে কোনো শিক্ষা নেই। চিন্তাভাবনা ও চেতনার উন্মেষ নেই। মানবতা, সততা, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ শিক্ষা নেই। না আছে ভাষা জ্ঞান, ভাবুক মন, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। যারা উচ্চশিক্ষায় যাচ্ছে, তাদেরও গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে, এ নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। দিন পার হয়ে যাচ্ছে। এমন কি শিক্ষকেরাও

চুপচাপ, বেতন নিয়েই তৃপ্ত বোধ করছেন। চাকরি বাঁচাতে ছাত্র-হাজিরা খাতায় ভুয়া নাম উঠোচ্ছেন। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ কুসুমকলি যে প্রস্ফুটিত না হয়ে প্রতিনিয়ত কুড়িতেই ঝরে যাচ্ছে, দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে, জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে– এ নিয়ে কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই। শিক্ষকদেরও বিবেকের কোনো দংশন নেই, দায়িত্ববোধ নেই। স্কুল কমিটিরও কোনো টুঁ-শব্দ নেই; সবাই রাজনীতি নিয়ে ও যার যার ধান্দায় মহাব্যস্ত। ছাত্রছাত্রীদের মা-বাপও নির্বোধ-নির্বিকার। এমন করে বিশাল একটা অবুঝ জনগোষ্ঠীর জীবনকে আমরা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছি। আবার জনসম্পদের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে উন্নয়নের জিকির পাড়ছি। কখনো হা-হুতাশ করছি, কখনো বিকারগ্রস্ত লোকের মতো প্রলাপ বকছি। দেশের উন্নয়নের কথা বাদ দিলেও যে অগণিত মানবসন্তান জীবনযুদ্ধে শুরুতেই হেরে গেল, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলো, তারা এই অন্ধকার মানবেতর জীবন কাটানোর জন্যই হয়তো পৃথিবীতে জন্মেছিল, এ কথাই মেনে নিতে হয়। নইলে তাদের এই হতচেতন বঞ্চনাভরা জন্মের সার্থকতা কোথায়?

প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি হাই স্কুলের খোঁজ-খবরও ভালোমতো নিলাম। আশপাশে যত হাই স্কুল আছে একই অবস্থা। স্কুলে লেখাপড়া তেমন একটা হয় না। লেখাপড়ার জন্য বাসায় টিউটর। স্কুলে যাওয়া-আসা মানে স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়ে রাখা, লেখাপড়ায় বহাল থাকা। সময়ান্তে সার্টিফিকেট পাওয়ার বন্দোবস্ত। লেখাপড়ার মানও খুব নিম্ন। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা আদৌ নেই। লেখাপড়ায় বইয়ের পড়ার সাথে বাস্তব ঘটনাকে মেলাতে শেখে না। লেখাপড়া মনে চিন্তার উদ্রেক করে না, ভাবনা আসে না। মনের মধ্যে কোনো সৃষ্টিশীলতা জন্মায় না। টেক্সট বইও না, শুধু নোট মুখস্থ করার কর্ম। কোনো ভাষাজ্ঞান নেই, ভাষার ওপর দখল নেই। জীবনের জন্য শিক্ষা নেই, সমাজের জন্য উপযুক্ত মানুষ হবার শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যশিক্ষা নেই, নৈতিকতাশিক্ষা নেই, মানবতার শিক্ষা নেই। অথচ নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একটা হাই স্কুলের ঘটনা শুনে চোখ চড়কগাছে উঠে গেল। অনেক পুরোনো বেসরকারি স্কুল। অতীতে অনেক ভালো ভালো ছাত্র এই স্কুল থেকে পাস করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বর্তমানে স্কুল আছে শুধু টিউশনির ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের সেন্টার হিসেবে। স্কুলে শিক্ষকদের যাতায়াত অনিয়মিত। হেডমাস্টারসহ সব শিক্ষক টিউশনির ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষকরা প্রত্যেকে তাদের রোজগার থেকে হেডমাস্টারকে টিউশনির সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া বাবদ ঠিকঠাকমতো মাসোহারা দেন। এলাকার রাজনৈতিক দলের সুযোগ্য পোষ্যপুত্ররা মিলেমিশে স্কুল-কমিটিতে আছে। এই রকম মাসোহারা ও স্কুলের অর্জিত বেতনের একটা অংশ রেকর্ড-বহির্ভূতভাবে স্কুল কমিটির জনে জনে পায়। ফলে সবার মুখ

বন্ধ। স্কুলের কেরানি মহাশয় প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষা-রিপোর্ট শিক্ষা বিভাগে যত্নসহকারে পাঠাচ্ছেন। রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে কেউ-না-কেউ বক্তৃতার ঝড় তুলছেন। 'মাকালের ফল দেখতে ভালো, উপরি লাল ভিতরি কালো', আমি বলি সেই তো ভালো।

প্রাইমারি-হাইস্কুল ছাড়াও কওমি-দাখিল নির্বিশেষে বেশ কয়েকটা মাদ্রাসার খোঁজখবর নিলাম। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগুরুদের সাথে কয়েক দফায় বসলাম। ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে বুঝতে না দিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান বলতে তারা কী বোঝে আলোচনার মধ্যে আনলাম। দেখলাম, তারা শিক্ষা বলতে 'তাদের তৈরি' ধর্মীয় শিক্ষা এবং জ্ঞান বলতে ধর্মীয় জ্ঞানকেই বোঝে। আবার ধর্মীয় জ্ঞান বলতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিক জ্ঞান ও মাসআলা-মাসায়েল এবং পরকালের বিশ্বাসকে বোঝে। দেখলাম, সে অর্থে তারা সবাই মহাজ্ঞানী। বুঝলাম, তাদের এই বদ্ধমূল ধারণার বাইরে তারা যাবে না, আমিও বাকযুদ্ধে ওদের কাছে হেরে যাব। এই পাকাপোক্ত ধারণা তারা নিশ্চয়ই তাদের ওস্তাদদের কাছ থেকেই শিখেছে। এই একই কথা নিশ্চয়ই তাদের ছাত্রছাত্রীদেরও শেখায়। ছাত্রছাত্রীরা 'একবার চাবি মাইরা দিছে ছাইরা জনম ভইরা ঘুরতা-ছে'-র মতো ওস্তাদের শিক্ষার ভার আজীবন ভক্তিভরে বয়ে বেড়ায়। অন্য কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলাম না, পাছে 'মুরতাদ' (যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্মগ্রহণ করেছে) ফতোয়া জারি করে দেয়। ভাবলাম, ইসলাম যদি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হয় তাহলে জ্ঞান ও শিক্ষার আওতা এত সংকীর্ণ হয় কী করে! আমার সোজাসাপটা বুঝ এরকম– কুরআন ছাড়া ইসলাম ধর্ম অচল। কুরআন সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, বিশ্বনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, দর্শন, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিকস), মনোবিজ্ঞান ইত্যাদিসহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে বা বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়। এগুলো সবই ধর্ম ও শিক্ষার আওতার মধ্যে; ধর্ম ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এমনকি সমস্ত কুশাস্ত্র ও অপশাস্ত্রকেও ধর্মের অঙ্গীভূত করেছে, নইলে মানুষ এসব বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেবে কী করে? এসব বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে মানুষ দুনিয়া ও সৃষ্ট জগৎ চালাবে কী করে? মন্দ থেকে ভালোকে পৃথক করবে কী করে? জীবন-জীবিকা অর্জন করবে কী করে? প্লেনে চড়ে বিদেশ যাবে কী করে? একজন ব্যক্তি পকেটমারের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে না জানলে, তার থেকে সাবধান হবে কী করে? অথচ আমাদের আলেম সমাজের (?) একটা বড় অংশ জ্ঞান ও শিক্ষার জগৎকে কত সংকীর্ণ করে ফেলেছে! দুনিয়ার সবকিছুকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে কুরআন ও হাদিসের ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে ঘরে ঢুকে বেহেস্তের হুর গণনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ ও

শিক্ষার্থীদের সেদিকে অবিরাম টানছে। এই সংকীর্ণ গণ্ডিতে ধর্ম, ইসলাম ও মুসলমানদের দম বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

আজ দৈনিক পত্রিকার একটা খবরে চোখ আটকে গেল। রিপোর্টার যেন একটা ছোটগল্পের প্লট আঁকছেন। আমার কিছুটা দেখা ও অনেকের মুখে শোনা কথার মিল পেলাম। যদিও ঘটনাটা আমাদের এলাকা থেকে অন্তত শত কিলোমিটার দূরের। খবরের শিরোনাম ও খবরটা এরকম: 'শিক্ষকরা বাঁধছেন চুল, বেছে দিচ্ছেন উকুন; পরিদর্শনে গিয়ে ইউএনও হতভম্ব': "ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনায় মুখরিত হয়েছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ; ক্লাস শুরুর ঘণ্টাও বেজে গেছে। এক পিরিয়ড পেরিয়ে যায়, কখনও দুই পিরিয়ড; কিন্তু শ্রেণিশিক্ষক তখনও আসেননি। একটু পর দেখা গেল শিক্ষকদের কেউ গল্পে মশগুল, কেউ অন্য সহকর্মীর চুল বেঁধে দিচ্ছেন; কেউবা বেছে দিচ্ছেন উকুন। এমনই এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনে এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। শ্রেণিশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কচিকাঁচার দল হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছিল, তারা বড় অফিসার দেখে একদম চুপসে গেল। জিজ্ঞাসায় জানাল, স্যার-ম্যাডামরা তো এমনই করেন। অতঃপর বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসা সেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চক-ডাস্টার হাতে পাঠদান শুরু করলেন। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার ম... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রী... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বো... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রা... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দ... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে এমন তথ্যই জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ...। তিনি জানান, সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকেরও উপস্থিত পাননি তিনি। বেলা ১০টা পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষক আসেন না। রা... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পান, স্কুলের বারান্দায় এক শিক্ষিকার চুলের বেণি বেঁধে দিচ্ছেন একজন মহিলা। অন্য একটি স্কুলে এক শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা মাথার উকুন বেছে নিতে দেখেন তিনি। দ...সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কাউকে না পেয়ে নিজেই পাঠদান করেন। ... বলেন, 'সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ এখানে স্কুলগুলো সেভাবে তদারকি করা হয় না। শিক্ষকদের মধ্যেও রয়েছে দায়িত্বহীনতা ও আন্তরিকতার অভাব। ...।"

(সমকাল, ০৯ এপ্রিল '২২)।

সংশ্লিষ্ট কর্মকতা একটু বেশি দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন। দেশীয় বুদ্ধিতে হয়তো পরিপক্কতা আসেনি। স্কুলগুলো পরিদর্শনে যাবার আগে খবর দিয়ে যেতে হয়। এটাই বর্তমান রীতি। স্কুলের স্যার-ম্যাডামরা ও কমিটির সকলে পরিপাটি

হয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করেন। ক্যামেরায় ছবি তোলে, ফেসবুকে প্রচার পায়। কাজ দেখানো যায়। সুনজর বাড়ে, তাড়াতাড়ি প্রোমোশন হয় ইত্যাদি।

এটা পুরো দেশের লেখাপড়ার চিত্র। উদ্ধৃতি দিতে চাইনে; আবার না দিয়ে পারিওনে। মানুষ ভাবে আমার খাসলত খারাপ, তাই কাজ না পেয়ে শুধু নেগেটিভ কথা লিখি। আসলে পুরো দেশের অবস্থা যা শুনি ও দেখি, তা লিখি। আবার লিখলেই তো কারো চৈতন্যোদয় হয় না, আমার বইও আবার কেউ পড়ে না। তাই বলা যায়, প্রকাশের বাতিকে লিখি।

আমার প্রশ্ন, শিক্ষা ও সমাজের এই জরাগ্রস্থ অবস্থা, স্থবিরতা, দায়িত্বহীনতা, মানসিক জীর্ণতা ও কুটিলতা থেকে আমাদের সমাজ রেহাই পাবে কবে? এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়ইবা কী? বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটাই-বা বাঁধবেন কে? মানুষ যখন সামাজিক অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে নিয়মে ফিরিয়ে আনা কি এতই সহজ? সহজ নয় বটে, তবে চিকিৎসার অযোগ্যও নয়। ‘কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, দরকার রোগীর ধৈর্য এবং চিকিৎসকের প্রজ্ঞা’।

উন্নয়নের ধারা– এটা কোনো বস্তুগত অবস্থা না। এটা একটা মানসিক অবস্থার ধারণা। সুতরাং সরকারি কর্মব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর মানসিকতার উন্নতি না হলে তাদের দেওয়া সেবার মানোন্নয়নের আশা করা বৃথা ও সময়ক্ষেপণের অজুহাত। মানুষকে পাহারা দিয়ে বেশিক্ষণ পারা যায় না। মানুষকে সুশিক্ষিত ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হতে হবে। এজন্য নিয়মিত সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে তার জাগ্রত বিবেক সতত তাকে পাহারা দেবে। সে স্বেচ্ছায় নিজের ও সমাজের ভালো কাজে কর্মব্রতী হবে।

রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা আছে তাদের নিজেদের স্বার্থ ও দলীয় ধান্দায়, জীবনের কর্দমাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পথে। তাদের সংস্পর্শে সামাজিক শাসন, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ধর্ম-কর্ম, ন্যায়পরায়ণতা সবই আজ মৃতপ্রায়। এরা আছে অন্যায়-অবিচার, জুলুম, লুটপাট, অন্তবিগ্রহ, মারামারি, রামদা-কিরিচের ধার পরীক্ষা, কুটিল চালবাজি-ধাপ্পাবাজি নিয়ে। শিক্ষকরা সমাজের শিক্ষাগুরু। তারা আছে প্রাইভেট-টিউশনি, সংসারধর্ম ও মোসাহেবি নিয়ে। মাদ্রাসার হুজুরেরা আছে গতানুগতিক ধর্মব্যবসা-ফতোয়া-খণ্ডিত শিক্ষা ও বেহেশতে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে। সমাজের অভ্যন্তরে অগণিত সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, কর্মজীবী, ভালোমানুষ রয়ে গেছে, যারা সামাজিক নিগ্রহ, দুর্নীতি, অপশাসন, মান-সম্মান হারানোর ভয়, মিথ্যার দাপটে বাকরহিত, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, হতাশায় ঘরাবদ্ধ

হয়ে ক্রমশই নিঃশেষিত। তাহলে বর্তমান এই সমাজটা কার? দায়-দায়িত্ব কার? সব অন্যায়-অবিচার, অনিয়ম, অশিক্ষা, অন্ধকার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এভাবেই সময়ের অনিবার স্রোতে আমরা সামনে এগোচ্ছি।

এই গা-সওয়া অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে একটা সামাজিক ধাক্কা দরকার। একে বলে সামাজিক আন্দোলন। সুশিক্ষিত-সমাজসচেতন জনগোষ্ঠীর অহিংস, সুশিক্ষা, সত্য ও সুনীতির আন্দোলন। নইলে এই থিতানো হাজামজা অবস্থা যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ধাক্কা না দিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না। ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে স্টার্ট করে দিতে পারলেই গন্তব্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন অন্তত দেখা যায়, নইলে নয়। কিন্তু প্রশ্ন, ধাক্কাটা কাকে দিয়ে দেবেন? কে আগে শুরু করবে? এজন্য একটা সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দরকার, যা হবে সমাজের আলোকিত মানুষের সমাবেশ।

আমি বর্তমানে সমাজের এই আলোকিত মানুষের খোঁজে আছি। এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যে এরা এখনো সমাজে টিকে আছে। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনতে হবে। একত্র করতে হবে। আলোর ঠিকানা দিতে হবে। একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে। পথ দেখাতে হবে। হাত-জোড়া খুলে দিতে হবে। বলতে হবে, ‘যাও, এবার সামনে চলো, দেশের সেবা করো, সমাজ উন্নয়নের কাজ করো। এই সামাজিক শিক্ষা-সেবার নামই ‘ধর্ম-কর্ম’। এছাড়া কোনো বিকল্প তো আমি দেখিনে। ‘এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!’

২.

শিক্ষার সামাজিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত

নিজ এলাকাসহ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবস্থা পারতপক্ষে মুখে আনতে চাইনে। আবার দেশের সার্বিক পরিবেশ ও মানুষের মনোজাগতিক পরিবেশ নিয়ে কিছু করতে গেলে অবস্থাকে এড়িয়েও চলা যায় না– একটু বললেও বলতে হয়, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। প্রতিদিনের পত্রিকাটা যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং পোড়া চোখ দুটো সমাজের দিকে মেলে ধরলেই ভূত-ভবিষ্যৎ মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায়; আমরা কোথায় যাচ্ছি বোঝা যায়। এজন্য কখনো খেদোক্তি করে বলি, 'পোড়া চো-ও-খ, পোড়া চোখ, কেন তুই বন্ধ থাকিস না, কেন তুই অন্ধ থাকিস না... ।' কথা ছিল রাজনৈতিক নেতারা তাদের কর্মীদের সাথে নিয়ে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা করবে। জনসেবা, সমাজসেবার জন্যই রাজনীতি। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে সবকিছু দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বলা যায়, কোনো রাজনৈতিক দলেরই গঠনতন্ত্রের মূলনীতির সাথে তাদের কথা ও কাজের কোনো মিল নেই। সকল নোংরামি, কুশিক্ষা, কুটিলতন্ত্র ও জিঘাংসার আঁতুড়ঘর এখন এই দিগভ্রষ্ট, নীতিবিবর্জিত রাজনীতি। রাজনীতি এখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশ ও সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাটের একচেটিয়া ব্যবসা। দেশ ও সমাজের লোকজন যত অসচেতন, অশিক্ষিত, লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, লুটপাট ও শোষণ প্রক্রিয়া তাদের ততই সহজ হয়। সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার ধস যত বেশি হয়, ততই ওদের চাওয়া-পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। তাই এখান থেকে জনকল্যাণ ও জনসেবা চাওয়া শ্রাবণের নিকষ-কালো ঘনঘোর অবিশ্রান্ত বর্ষায় শরতের দিগন্ত-বিসারী স্নিগ্ধ-রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত নীলাকাশ চাওয়ার শামিল। এরা দেশকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠীর গন্তব্য যে কোথায় তা মনের চোখে ভেসে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠাটা হয়তো এ দেশে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ইচ্ছে করে দেখতে চাইনে, তবু চোখে চোখে ভাসে। চোখ বন্ধ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে কেন জানি লাগামহীন দুর্নীতি, লুটপাট, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, দমন-পীড়ন, জিঘাংসা, অব্যবস্থাপনা, কুশিক্ষা, মারামারি, খুনখারাপি, গায়েব, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদির ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিভূ চটকদার ভেক ধরে ভিন্ন পথে দেশের সম্পদ লুটপাট করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, একই উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। সব বিকৃত ফন্দি-ফিকির বিষবাষ্পের মতো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, সমাজকে গ্রাস করেছে এবং করে চলেছে। সমাজের দু কূল প্লাবিত করে ছেড়েছে।

ওদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, এত সুন্দর একটা দেশ, অথচ ওরা জনগোষ্ঠীকে জন-আপদে পরিণত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। দেশকে বানিয়েছে গুরুর সম্পত্তি, যেখান থেকে সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা অনেক কঠিন। কার দোষ, এটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। দোষ আমাদের অপরিণামদর্শী, দায়িত্বহীন চিন্তা-চেতনার। যত গলাবাজিই করিনে কেন, আর যা-ই বলিনে কেন, সত্য বলতে কি, এ দেশের জটিল-কুটিল স্বার্থান্ধ বিকৃত রাজনীতি ও দেশ পরিচালনা সুস্থ সামাজিক ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। সামাজিক পরিবেশে চলে-ফিরে-খেয়ে-বলে সুখ-শান্তি উঠে গেছে। এই নীতিহীন, চরিত্রবিধ্বংসী, মনুষ্যত্বহীন, সর্বভুক রাজনৈতিক স্রোতধারা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা উন্নয়নে বিলীন হওয়া জরুরি। শুধু এ দেশ কেন, বিশ্বের অনেক অনেক দেশেরই একই অবস্থা। বিশ্বরাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, রাজনীতিবিদরা দেশ পরিচালনার নামে গদিরক্ষার স্বার্থে পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপন ও বসবাসের উদ্দেশ্যকেই পথ ভুলিয়ে ভিন্ন পথে নিয়ে যাচ্ছে। ভোগবাদী ধর্মহারা সম্প্রদায় তথাকথিত আধুনিকতার ধুয়ো তুলে তাদের বিকৃত বাতিল ভিত্তিহীন মতবাদ (‘নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ’) নিয়ে প্রতিটা রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামে খ্যাত জনগোষ্ঠীর একটা জড়বাদী অংশ তাদের টোপ গিলে বসে আছে। তারা বিজ্ঞানশিক্ষার মোড়কে ধর্মহীনতার ছবক দিয়ে কৌশলে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মহারা সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তারা মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার টুঁটি টিপে ধরে শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মানবিক এ গুণগুলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই সতীর্থ-জিঘাংসু পরিবেশ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ ও সুশিক্ষা আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং যে বীণা বাজে না তার অস্তিত্ব থাকা না-থাকা সমান কথা। সেজন্য অন্য কোনো পথে শিক্ষা, জনসেবা, সমাজসেবা, জাতীয় মুক্তি খুঁজতে হবে। কারণ মানুষের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ধারণা থেকে মানুষ ও সমাজকে তো আর বাদ দেওয়া যায় না! আর তাই সুশিক্ষিত মানুষ ও আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন মানুষ ও সমাজ গড়তে হবে। পচা-আলুর বস্তা থেকে দুর্গন্ধময় পরিবেশ ছাড়া ফুলের সুবাসিত আমেজ দুরাশা মাত্র। সেক্ষেত্রে আতর ছিটিয়ে দুর্গন্ধ দূর করার চেষ্টা না করে বরং পচা-আলুর বস্তাটাকেই ক্রমশ সরিয়ে ফেলাটা উত্তম। পরিবেশকে দুর্গন্ধমুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর পরিবেশের দারুণ প্রভাব আছে। দেশের সাধারণ মানুষ

সামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। কখনো ইচ্ছে করে শিক্ষা না নিতে চাইলেও মনের অজান্তে শিক্ষা মনে গেঁথে যায়। তাই এই দুর্গ্রহ দুর্গতি।

আবার একটা গল্প বলি। একদিন গ্রামের পাশে একটা বাজারের একটা বাড়িতে গেছি। তিনতলা বাড়ি। নীচতলার অংশটা ভাড়া দেওয়া। পাশাপাশি চারজন ভাড়ায় থাকে। তিন তলায় বসে গল্প করছি। নীচ তলার এক ভাড়াটে এসে আমার সাথে গল্প করতে লাগলো। কিছু উপদেশ-পরামর্শ চাইলো। তার সম্বন্ধে আমি আগেও জানতাম। সে পাশের জেলা শহরের কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিল। এক বছর যেতে না যেতেই পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মোবাইল ফোন ও ফেসবুক মনমতো ব্যবহার করে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছে। শ্বশুর মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশে শ্রমিকের চাকরি করে। জামাইকে ব্যবসাতে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়। নিয়মিত টাকা পাঠায়। ছেলেটা একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারবো কি-না জিজ্ঞেস করলো। আমি তার প্রিন্টিং ব্যবসা কেমন চলছে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, বিভিন্ন খরচ-খরচা করে লাভ থাকছে না। ঘর ভাড়া দিতে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে। বললাম, আর কি কি কাজে খরচ হচ্ছে? জানলাম, একজন পার্ট-টাইমার কম্পিউটারে প্রিন্টিং সামগ্রী প্রস্তুত করে দিয়ে যায়। তাকে মাসে ছয় হাজার টাকা দিতে হয়। আরেকজন পার্ট-টাইম মেশিনম্যান আছে। সাথে আরো একজন হেল্পার আছে। তাদেরকে মাসে দশ/বারো হাজার টাকা দিতে হয়। বললাম, ঘর ভাড়া তুমি অন্যদের মতো বাজার দরে দিচ্ছ। এখানে কমিয়ে বেশি টাকা সাশ্রয় করতে পারবে না। তুমি কম্পিউটারের কাজটা শিখে নিতে পারো। তেমন কঠিন কিছু না। বসে না থেকে কম্পিউটারের কাজটা তুমিই করতে পারবে। মেশিনম্যানের কালি মেশানোর কাজটাও তুমি শিখে নিতে পারো। এটাও তোমার জন্য সহজ। এতে তোমার অনেক টাকা সাশ্রয় হবে। যখন তোমার ব্যবসা পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে, তুমি একটা ফুল-টাইম মেশিনম্যান নিয়োগ দিও।

ছেলেটা তেমন কোনো কথা না বলে নীচে চলে গেলো। ঘণ্টাখানেক পরে একজনকে সাথে নিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছনে সেনিটারি মিস্ত্রিরির কাজ দেখতে গেলাম। দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাজ দেখছি। একটু পরেই ওই ছেলেটাকে এক বন্ধুর সাথে নিয়ে বিল্ডিংয়ের পাশের কোনায় একটা মটরবাইকের দু পাশে দুজন দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলাম। পিছনের পাশে আমরা আছি বলে ওরা আমাদেরকে দেখতে পারছে না। এক বন্ধু বলে চলেছে, ‘তুই তো দেখছিস, প্রিন্টিং ব্যবসায় তোর পোষাচ্ছে না। শ্বশুরের ওপর পুরো নির্ভর হয়ে গেছিস। আমরা কলেজে থাকতে তো কিছু দিন স্লোগানে গিয়েছি। একটা দলের প্রতি সমর্থন আছে। চল, পুরোদমে দলে যোগদান করি। আমরা লেখাপড়া জানা ছেলে। অনেক দায়িত্ব

নিয়ে কাজ করতে পারবো। রোজগার অনেক ভালো। অল্প দিনেই ভালো টাকা হাতে চলে আসবে। পরে অনেক বড় নেতাও হওয়া যাবে। তুই কম্পিউটার অপারেটর, মেশিনম্যান হতে যাবি কেন!' জীবনমুখী আরো অনেক কথাই বললো। সিদ্ধান্ত নিলো, ব্যবসা ছেড়ে দুজনে রাজনীতি করবে। ঐ দুটো ছেলে কি দেশসেবা ও সমাজসেবার জন্য রাজনীতিতে ঢুকতে চাচ্ছে? ওদের মুখের কথার সাথে প্রকৃত উদ্দেশ্যের কতটুকু মিল পাওয়া যাবে? গলদটা কোথায়? কলেজ পর্যন্ত পড়তে গিয়ে নীতি-নৈতিকতা, দেশপ্রেম, মানবিকতা বলে কিছু শিখেছে কি না? সমাজ থেকেই-বা নীতিকথাগুলো শিখেছে কি না?

মনের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার বালাই না থাকলে মানুষ যেখানে অল্প পরিশ্রমে লাভ বেশি পাবে, সেদিকে চলে যাবে। সুবিধাজনক জায়গায় জিভ উল্টে স্বার্থ হাসিলের খেলায় মাতবে। উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করার মতো বর্তমান রাজনীতি ক্ষমতা ও টাকা ছিটিয়ে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন, স্বার্থান্ধ-দুর্নীতিবাজ ও মতলববাজ লোকগুলোকে একজায়গায় জড়ো করছে। তারপর টাকার খেলা শুরু করছে। সামাজিক শিক্ষার পুরোটাই ধসে গেছে। শিক্ষা থেকে নীতিকথা, সততা, চরিত্রগঠন, মানবতা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা দিনে দিনে আগেই সরে গেছে, রাজনীতিতেও তাই। নইলে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষা নিয়েও টাকা ধরার জন্য ওই ছেলে-দুটো রাজনীতিতে যোগদান করতে চাইতো না। এ দেশে কলুষিত রাজনীতির পক্ষে স্বার্থের বিনিময়ে স্লোগান হাঁকতে পারলেই দেশপ্রেমের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া যায়। এ দেশে বিবেকের দংশন বলতে কিছু নেই। দেশের মানুষ নষ্ট হয়ে গেলে জাতীয় সম্পদ কে রক্ষা করবে? এর বিপরীতে বলতে হয় দেশের অর্থ ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করা দরকার। এজন্য সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দরকার। শিক্ষায় সততা, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা আনা সময়ের দাবি। এছাড়া বাঁদরের হাতে পিঠে ভাগের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তথাকথিত রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিদের হাত থেকে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা ও উন্নয়নের নামে টাকা বরাদ্দ-ব্যবস্থা সরিয়ে নিতে হবে, যাতে রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা না হতে পারে। তখনই রাজনীতি থেকে 'চাটার দল' ও খাদকগোষ্ঠী বিদায় নেবে। দেশসেবক, সমাজসেবক রাজনীতিতে ঢুকবে। এই মানুষ দিয়েই সবকিছু সম্ভব। সব রোগেরই ট্রিটমেন্ট আছে। বিষয়টা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

আবার রাজনীতি ভালো হয়ে গেলেই পরিবেশ হঠাৎ ভালো হয়ে যাবে– এ আশাও করিনে। সমাজে সুশিক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো মটরগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে নতুন ইঞ্জিন কিনে লাগিয়ে গাড়িকে আবার ভালোভাবে চালানো সম্ভব হয় বটে; কিন্তু কোনো মানুষের মগজ একবার বিকৃত

চিন্তার আস্তানা হয়ে গেলে তার জীবদ্দশায় সুস্থ পথে ফেরা হয়তো আর সম্ভব হয় না। সাগর ঝড়-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কালোরাত্রি পাড়ি দেবার পরে শান্ত হয় বটে, তবে দিগন্ত-বিস্তৃত, লণ্ডভণ্ড, বিক্ষিপ্ত, ফেনিল কর্দমাক্ত রেষ রেখে যায়। এ দুর্নমিত চিহ্ন মুছতে সময় লাগে। জনগোষ্ঠীর মানসিকতা একবার বিকৃত হয়ে গেলে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এমনিতে সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। তবু আবার নতুন করে গড়ার কাজ তো শুরু একবার করতেই হয়। তখন সমাজের লোকদেরকে দলে দলে সময় নিয়ে সুশিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার হয়। ভালো ভালো উপদেশমূলক কথা, মানবতার কথা, জীবনের উদ্দেশ্যের কথা, সুস্থ জীবনের কথা তাদেরকে বার বার বলতে হয়; জীবনের জন্য করণীয় বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। এছাড়া নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে নতুন করে গড়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটাই বাস্তবতা। তবে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আলোর ইশারা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট একটা বিশাল অংশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জানি। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি এখনো ভালো আছেন। এছাড়া সমাজের একটা সচেতন ও সুশিক্ষিত অংশ যাদেরকে রাজনীতির কালিমা এখনো কলুষিত করতে পারেনি, তারাও এই সমাজেই নিভৃতে জীবনযাপন করছেন। সমাজ পচে গেলেও বেশ কিছু মানুষ সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো অক্ষত আছেন। তারা রাজনীতির কর্দমাক্ত বানভাসি স্রোতে ভেসে যাননি। এটা আশার কথা। এদেরকে নিয়ে আমরা আবার আশায় বুক বাঁধতে পারি। এদেরকে জাগিয়ে ঘরের বাইরে বের করে আনা যায় কি-না ভাবা দরকার। একত্র করা দরকার। সব পথই তো আর অসীমে যায় না, কোনো কোনো পথ আছে ঘুরে ফিরে আসে। মানবসম্পদ উন্নয়ন পড়তে গিয়ে, আবার বাস্তবেও দেখেছি, কেউ অন্য অনেকের খাবার জোর করে নিজের উদরজাত করে তৃপ্তি পায়, আবার কেউ নিজের খাবার অন্যদের ভাগ করে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। কেউ নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, আবার কেউ বনের মোষ নিজের খোঁয়াড়ে নিয়ে বেঁধে নিজের বলে দাবি করে। এটা মানুষের প্রকৃতি। উভয় ধরনের মানুষই তো সমাজে আছে। মানুষ ষড়রিপুর আধিক্যে মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, পঙ্কিলতার সাগরে ডুবে যায়, আবার মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধ ফিরে পায়, মানুষের মতো মানুষ হয়, মানুষের মতো কর্ম করে, আচরণ করে। মানুষের অন্তর্বিষ্ট স্বভাব বাদ দিলে সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে ‘মানুষের মতো মানুষ’ রূপে গড়ে তোলা যায়। এভাবেই সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও টেকসই জাতি গড়ে ওঠে। শ্রুতিকটু কথাটা হলো: বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মানসিকতাই তো সুস্থ নয়, তা সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে

উঠবে কীভাবে? বিশ্বময় অসুস্থতার প্রতিযোগিতা, ষড়রিপুর প্রাবল্য, নির্লিপ্ত-নিরুদ্দিষ্ট মানবতা। চারদিকে কালিমামাখা চিন্তার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের নিকৃষ্ট চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। অথচ ধরণী চায় সৃষ্টির অনুগামী টেকসই চিন্তা-চেতনা, চিন্তার উৎকৃষ্টতা। মানুষ চায় ব্যক্তিস্বার্থ, প্রকৃতি চায় সামষ্টিক স্বার্থ। তবে ব্যক্তির সুষ্ঠু চিন্তাধারা সামষ্টিক সুস্থ চিন্তার উৎস। ব্যক্তির মানসিক উন্নতির মধ্যে সামষ্টিক উন্নতি নিহিত। তাই ব্যক্তির মানসিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তির উন্নতির মধ্য দিয়ে সামষ্টিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

লায়ন্স ক্লাব ও রোটারি ক্লাবের সদস্যরা নিজে চাঁদা দিয়ে, অনুদান দিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, সমাজসেবা করে। জনসেবা ও সমাজসেবাও একটা অনিবার নেশা। এর মজা যে পেয়েছে সে-ই মজেছে– সমাজসেবকরা জনসেবা, সৃষ্টির সেবা করার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার অনেক গোষ্ঠী আছে– জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, ইহকালকে উপেক্ষা করে, কখনো নিরর্থক জেনে পরকালের মুক্তির নেশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আমি তো দেখি, ইহকালের শিক্ষা, কর্ম, চিন্তা-চেতনা, সমাজসেবা, জনসেবা ও সৃষ্টিসেবার মধ্যেই ইহকালের ইবাদত, পরকালের মুক্তি। পুরো ধর্মদর্শন এই সৃষ্টি, কর্ম ও সৃষ্টিসেবার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। যারা পরকালের মুক্তি চান, তারাও তো একটু ভেবে দেখে, জনসেবা ও সৃষ্টিসেবায় যোগ দিতে পারেন। সৃষ্টিসেবার মধ্যে পরকালের মুক্তি খুঁজতে পারেন। অনির্বাণ প্রশমনে সৃষ্টিসেবায় নির্বাণ পেতে পারেন। স্রষ্টায় একান্তভাবে বিশ্বাসী প্রতিটা লোককেই সৃষ্টিসেবায় ও মানবসেবায় আনা সম্ভব। তাদেরকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝাতে হবে।

জীবনের অনেকটা সময় স্কাউটিং-এর সাথে জড়িত ছিলাম। সেখানেও ছেলেদের ব্যবহারিকভাবে সমাজসেবা শেখানো হয়, মনকে জনসেবাধর্মী করে গড়া হয়। প্রত্যেক স্কাউট স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনে বিশ্বাসী। এটা তাদের অন্যতম মূলনীতি। অনেক স্কাউট মানবসেবায় নিজের সময় ও জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়। তারাও তো এ দেশেই আছে। হয়তো অনুকূল বাতাস পাচ্ছে না। কোনো অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী প্লাটফর্ম পাচ্ছে না। তারাও সমাজসেবায় যোগ দিতে পারে। ছাত্রজীবনে স্কাউটের ছায়াতলে সমাজসেবা ও ত্যাগের প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মজীবনে এসে শিক্ষা ও সমাজসেবায় যোগ দিতে পারে। বর্তমানে এ দেশের অগণিত লোক বিভ্রান্ত-বিপথগামী হয়ে ‘ভোগেই তৃপ্তি’ তত্ত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদেরকে যদি সুশিক্ষা দিয়ে বোঝানো হয়– ভোগে তৃপ্তি আছে সত্য, সে তৃপ্তি সাময়িক বা ক্ষণিক। ত্যাগেই প্রকৃত তৃপ্তি, সে তৃপ্তি অনন্ত ও নিরন্তর। তখন তারাও সৃষ্টিসেবায় যোগ দিতে পারে। দরকার সৃষ্টির উপযোগী সুশিক্ষা ও উপযুক্ত

প্রশিক্ষণ। ‘এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন।’ দরকার মানুষের মধ্যে মানুষ রত্নকে জাগিয়ে তোলা, সুশিক্ষিত করা।

সমাজে বিভিন্ন পক্ষ আছে। তার মধ্যে রাজনীতিবিদরা একটা পক্ষ। বর্তমান সমাজে এরা জোটবদ্ধ ও সক্রিয়। স্থানীয় সরকারে রাজনৈতিক দলীয় নির্বাচন রীতি চালু হওয়ায় এদের তৎপরতা ও অপতৎপরতা এ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এর ফলে আমরা সবাই কেমন আছি, সচেতনমহল পুরোটাই অবহিত। ‘পিরিতে মজেছে মন, কী-বা মুচি, কী-বা ডোম।’ এরা ব্যক্তিস্বার্থের নেশায় যৌথভাবে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছে। সব একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো একদলে যোগ দেয়। ব্যক্তিস্বার্থ তখন দলগত স্বার্থে রূপ নেয়। এদের সুপথে নিয়ে আনা এতটা সোজা না। আমি সে কাসুন্দি ঘাটতে গিয়ে উদ্দেশ্য-বিচ্যুত হতে চাইনে। ধানের হাটে মুখ-চুলকানো ওলও নামাতে চাইনে। শুধু বলবো, ‘যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।’ তাদের কার্যকলাপের কিয়দংশ ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। তাদেরকে বর্তমানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা মানে দুধে গো-চোনা মেশানো। স্বল্প মেয়াদের মধ্যে তাদের দিয়ে সমাজ উন্নয়ন এবং সুস্থ ও শিক্ষিত সামাজিক ধারা তৈরি করা সম্ভবপর নয়। পরিবর্তিত সমাজে অর্থাৎ রাজনীতির খোলনলচে বদল হবার পর দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে হয়তো সুস্থ সামাজিক উন্নয়নে তারা অবদান রাখতেও পারে।

বর্তমান সমাজে কওমি মাদ্রাসাশিক্ষা বেশ প্রসার লাভ করছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর দেখতাম চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলাতে বেশি কওমি মাদ্রাসা-পড়ুয়া লোকের সমাগম। এখন দেশের সর্বত্র প্রায় গ্রামে-গঞ্জে মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। সেখানে দীনি-ইলম (ধর্মীয় শিক্ষা) চালু হয়েছে। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় জ্ঞানের সংস্পর্শ পাচ্ছে। ধর্মীয় সমাজ গড়ে উঠছে। প্রতিটা গ্রামেই সভা-সমাবেশে টুপিধারী কিছু লোক হাজির হচ্ছে। ধর্মসভা প্রতিটা এলাকায় প্রতি মৌসুমে প্রতিনিয়ত হচ্ছে। জানাজা ও ইমামতি করতে লোকের অভাব হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে না। এলাকার সাধারণ মানুষ মৌলভিসাহেবদের এবং ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করছে। কখনো এলাকার প্রতিটা বাড়ি থেকে ধান-চাল উঠিয়ে কিংবা চাঁদা উঠিয়ে কখনো-বা স্বাবলম্বী পরিবারের আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে চেয়ে-চিন্তে মৌলভি-মাওলানাদের খাবারের ব্যবস্থা ও পারিশ্রমিকের সংস্থান হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামে-গঞ্জে এভাবে অবহেলিত অনানুষ্ঠানিক, অনৈয়মিক ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে কওমি মাদ্রাসা টিকে আছে। ধর্মভীরু মানুষের দান ও ত্যাগে টিকে আছে। এভাবে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে কিছু

কিছু মাদ্রাসা সুনামের সাথে ধর্মশিক্ষা দিয়ে আসছে। এতে একটা জিনিস বোঝা যায়, মানুষ পরকালের ভালো কিছু আশা করে এখনো দান-খয়রাত ও পরোপকার করে। উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ে এ দেশের গরিব, অসহায়, এতিম শিশুদের বিনা-খরচে থাকা-খাওয়া ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ-ধরনের ব্যবস্থা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নেই। নিঃসন্দেহে এটা একটা সমাজ-সেবা ও সমাজকর্ম। এছাড়া সামাজিক সমস্যার সুন্দর একটা সমাধানও বটে। শিক্ষা-নিয়ে-বেরোনো ছাত্রছাত্রীদের সবাই খোদা-ভীরু, সচ্চরিত্রবান এবং অল্পে তুষ্ট। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অল্প বয়সে বখে যায় না। কোনো সমাজ-বিগর্হিত কাজে সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের জন্য অ-ক্ষতিকর জনগোষ্ঠী তৈরির কাজে নিয়োজিত– এটাও একটা সমাজকর্ম। তারা তাদের সংগঠনকে অরাজনৈতিক সংগঠন বলে দাবি করে। তবু রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে।

এর সাথে জীবনমুখী একটা বাস্তব কাজের কথা বলি (হাইপথেটিক্‌ল্‌ বা উপপ্রমেয়মূলক)। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। টয়লেটে গেলাম। প্যান বা কমোড ব্যবহার করে টয়লেটের কাজ সারলাম। সাবান ব্যবহার করে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করলাম। অতপর টুথপেস্ট-ব্রাশ ব্যবহার করে দাঁত মাজলাম; টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে অজু করলাম। স্যান্ডেল পায়ে ঘরে এলাম। ঘরের ফ্যানটা ছেড়ে নামাজে দাঁড়ালাম। নামাজ শেষে দুনিয়ার কাজে ছড়িয়ে পড়লাম। প্রথমেই সেল ফোনে একটা ফোন কল এলো। সে মতো পাশের শহরে যেতে হলো। বাসে চড়ে সেখানে গেলাম। অফিসের ইঞ্জিনিয়ার আমাকে গ্রামের মাদ্রাসা তৈরির বিষয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। ফেরার পথে দোকান থেকে কিছু ওষুধ কিনলাম, ছেলে-মেয়েদের পড়ার জন্য দুটো কলম ও বই কিনলাম। এলাকার মাইকে ভেসে এলো– আমাদের পরিচিত এক দীনদার ভদ্রলোক আজ সকালে মারা গেছেন; বাদ জোহর পাশের মসজিদে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জোহর নামাজ শেষে ঘরে ফিরে একটা প্লেটে খাবার নিয়ে খেলাম, এক গ্লাস পানিও খেলাম।

ওপরের সাদাসিধে একটা উদাহরণের মধ্যে টয়লেটের প্যান, সাবান, টুথপেস্ট-ব্রাশ, টিউবওয়েল, স্যান্ডেল, ফ্যান, সেল ফোন, বাস, মাদ্রাসা তৈরি, ওষুধ, বই, কলম, মাইক, খাবার প্লেট, গ্লাস তৈরি প্রভৃতি সবকিছুই কারো না কারো কাজ এবং পেশা। এই কাজ ও পেশা দিয়েই মানুষ ও সৃষ্টির কল্যাণ। আমরা যদি স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এই কাজ ও পেশাকে বাদ দিয়ে ফেলি, তাহলে মানুষ ও সৃষ্টি টিকে থাকতে পারবে কি না? মানুষের সাধারণ জীবনযাপন ও কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে কি না? অথচ আমাদের অজান্তেই আমরা তা করছি।

আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মযাজক/পুরোহিতরা কর্মবিমুখ পেশা বর্ণবৈষম্যবাদ দিয়ে আগেই শুরু করেছিল। মুসলমান পুরোহিতরা সামাজিক রীতির কারণে তাদের দেখাদেখি সে-পথেই গেছে। হিন্দু পুরোহিতরা বাস্তবতার তাগিদে অনেকেই জীবনকর্মে ফিরে এসেছে। মুসলমান পুরোহিতদের সংখ্যা এ উপমহাদেশে কর্মবিমুখ পেশায় বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ দেশের মৌলভি-মাওলানারা তাদের শিক্ষার মধ্যে মানবজীবনের জন্য যত কল্যাণমূলক কাজ অন্য ধর্মের লোকের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। স্রষ্টার সৃষ্টি পরিচালনায় ভূমিকা রাখছে না বললেই চলে; 'হক্কুল ইবাদ'-এর দায়িত্বও পালন করছে না। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ও তসবিহ-তেলাওয়াত করে আর্থিক অনটনের মধ্যে দুনিয়াদারি বজায় রেখেছে। এরা অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশত সৃষ্টির দর্শনকেই পাল্টে দিয়েছে। অন্য ধর্মের লোকেরা সৃষ্ট বিশ্বের উচ্চতর পেশাকে বেছে নিয়েছে, সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। সকল কল্যাণমুখী কাজ করে মুসলমানদের ওপর প্রভুত্ব করছে। মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি থেকে পিছপা হয়ে কবরমুখো পা এগিয়ে দিয়ে বসে আছে। জীবনযাপনে অন্য ধর্মের লোকের গোলামি করে চলেছে। আত্মমর্যাদা বোধ বেহেশত যাবার আশায় ভুলে গেছে। তাই প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। সবই চিন্তা-চেতনার পশ্চাৎপদতা।

এই নিবেদিতপ্রাণ মৌলভি-মাওলানারা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মনের অজান্তেই কিংবা অজ্ঞতাবশত তাদের চিন্তা-চেতনা-শিক্ষা ও জীবন-ধারণা দিয়ে মুসলমান জাতিকে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে একটা অনগ্রসর, অকর্মণ্য ও সৃষ্টির অযোগ্য জাতিতে পরিণত করে ফেলছে। মৌলভি-মাওলানারা প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা এ দেশে ধর্মহারা সেকিউলারপন্থিদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরির পথ করে দিয়েছে; নিজেদের অদূরদর্শী চিন্তা-চেতনা ও কর্ম দিয়ে করেছে। মৌলভি-মাওলানারা নিজে ও তাদের তৈরি ছাত্রছাত্রী সমাজে বেকার অথবা ছদ্ম-বেকার; পরিবার ও সমাজের বোঝা। নিত্য যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দু হাত পকেটে ভরে আল্লাহর ওপর ভরসা করে পড়ে থাকে। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নেই, উচ্চশিক্ষা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তিগত জ্ঞান নেই, উন্নত শিল্প-ব্যবসা শিক্ষাও নেই, উদ্দেশ্যহীন দুনিয়াদারী করে চলেছে। চিন্তা-চেতনা গোঁড়ামি ও আবেগপ্রবণতায় ভরা। সৃষ্টি ও জীবনযাপন বিষয়ে আত্মসচেতন নয়। তাদের অনেকে কোনো গঠনমূলক বুঝ নিতে চায় না। চিন্তা-চেতনায় বৈকল্য। তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সে অবস্থা থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসা অনেক কঠিন।

তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে আনতে গেলে কখনো কখনো তাদের কর্মকাণ্ড উগ্রতায় রূপ নেয়।

শত শত বছর আগে খেজুর গাছের নীচে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করা চলতো। ঘোড়ায় চড়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ দুই মাস ধরে অবিরাম চলতো। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার নিয়ে মানুষ যুদ্ধের শক্তিমত্তা দেখাতো। বর্তমানে মানুষ সুপারসনিক রকেটে চড়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাচ্ছে। নিজ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের শত্রুঘাঁটিতে রকেট-মারণাস্ত্র ছুড়ে অন্যকে ঘায়েল করছে। মহাকাশে ভূ-উপগ্রহ পাঠাচ্ছে। ভূ-উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে বিশ্বের কোথায় কে কী করছে দেখছে। পারমাণবিক শক্তির দাপট দেখাচ্ছে। চোখের পলকে তথ্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাচ্ছে। কোনো তারের সংযোগ ছাড়াই ভূপৃষ্ঠের এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তে বসে সরাসরি দেখছে। প্রায় সব কাজই মানবজাতি ও সৃষ্টির কল্যাণে হচ্ছে। এখন আর সপ্তম আশ্চর্য নেই, হাজারে-হাজার মহা-আশ্চর্য। অথচ বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক কোনো কাজে মৌলভি-মাওলানারা নিজে এবং তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করতে রাজি না। তাদের এখনো চৈতন্যোদয় হচ্ছে না। তারা বোঝে না, সময় এবং ঘটনাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। এটা করতে চেষ্টা করা এক ধরনের মানসিক বিকলতাও বলা যায়। অতীতের ঘটনা ও কর্ম থেকে আমরা শিক্ষা ও আদর্শ নিতে পারি। বর্তমান আকাশচুম্বী যান্ত্রিক-ইলেকট্রনিক সভ্যতাকে অস্বীকার না করে সভ্যতার সাথে অভ্যস্ত হয়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কাজে-কর্মে নিজেদের সম্পৃক্ত করাটাই বুদ্ধিমানের ও জ্ঞানের কাজ। এজন্য তাদের বিজ্ঞান-ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষা নেওয়া দরকার, মন-মানসিকতার গঠনমূলক পরিবর্তন দরকার। তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যই তা দরকার, অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই দরকার। নইলে একটা জাতির ধ্বংস অনিবার্য। আমি মোবাইল ফোন তৈরি করতে পারিনে, তৈরি করার কথা কখনো চিন্তাও করিনে, শুধু চালাতে পারি। এটা হতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য– সৃষ্টির প্রয়োজনে কর্ম।

ইহলৌকিক জীবনযাপন, সৃষ্টিকল্যাণ, মানবসমাজ ও সৃষ্টিসেবা ছাড়া পরলৌকিক জীবন যে অসম্ভব তা এরা ভাবতে নারাজ। কত হাজারোভাবে যে মানবকল্যাণ ও মানবসেবা করা যায়, তা এদের মাথায় ঢোকে না। দুনিয়ার মানবকল্যাণ কীসে ও কীভাবে সম্ভব, তা নিয়েও এদের কোনো গবেষণা নেই, মাথাব্যথাও নেই। গবেষণা এরা বোঝেও না। তারা শুধু পরকালের জন্য নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও তসবিহ-তেলাওয়াতের মধ্যে ইবাদতকে খুঁজে পেয়েছে। জীবনের সকল কাজ-কর্মে, পেশায়, চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার নামই যে ইবাদত– এ ধারণা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিন্নমুখী অকর্মণ্য ব্যাখ্যায় গেছে। নামাজ,

রোজা, হজ, জাকাতের মধ্যেও যে দুনিয়াদারির সকল কাজ সুচারুরূপে করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা আছে সেদিকটা পুরোপুরি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। আবেগবশত শুধু কুরআন ও হাদিস মুখস্থ করে এবং মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে তর্ক করেই সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কুরআন ও হাদিসের প্রায়োগিকতা নেই। জ্ঞানান্বেষণ ও গবেষণা নেই। আত্মোপলব্ধি, আত্মসংশোধন নেই। সেজন্য ‘পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা’কে আংশিক জীবনে পর্যবসিত করেছে। দীনি-শিক্ষা কাকে বলে তা বোঝে না। দীনি-শিক্ষার আওতাকে খণ্ডিত করে, জীবনের সংকীর্ণ গলিতে আবদ্ধ করে শুধু পরকালের বিশ্বাস ও বেহেশত নসিবের শিক্ষা বলে মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে। বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট (ধর্মীয়-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত) ও তা থেকে উত্তরণ এবং জয়লাভের উপায় নিয়ে পুরোপুরি বে-ওয়াকিফহাল হয়েছে। থিও-পলিটিক্যাল যুদ্ধের মাঠ আগেই ছেড়ে দিয়ে হেরে বসে আছে; তাই জীবনের প্রতিটা পদে পদে জাতসুদ্ধ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধমে মানবকল্যাণ ও চেতনার উৎকর্ষই যে এ যুদ্ধে জেতার একমাত্র উপায় তা মাথায় আসে না, বুঝতেও চায় না। জীবনের বাস্তবতা বুঝতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলেও উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। না বোঝার কারণে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা (দুনিয়াদারি) থেকে মুসলমানদেরকে নিজেরাই কোণঠাসা করে ফেলেছে। এসবই মুসলমানদের দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার অভাব; মুখে ধর্মকে ‘পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা’ বলে মেনে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় অজ্ঞতা; অনগ্রসরতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পথে চেতনাহীন বাধা; যুগোপযোগী জীবনধারার অন্তরায়। পুরো ইসলামি বিশ্বে এ-ধারা বিদ্যমান; এ দেশে এটা আরো বেশি।

কওমি-শিক্ষাব্যবস্থা জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা থেকে পিছিয়ে ‘মাদ্রাসা ও দীনের খেদমতগার’ শিক্ষার তল্পিবাহকে রূপ নিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা (বিজ্ঞানময় কুরআন) ছাড়া জীবন চলে না। অথচ এরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বিধর্মীদের শিক্ষা বলে ফতোয়া দিয়ে, সমস্ত অফিস-আদালত-শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নিজেরা ঘরাবদ্ধ হয়েছে। তারা অন্যের গলগ্রহ হয়েছে। এতে বস্তুবাদী ও ইহবাদী শিক্ষার ধারক ও বাহকদের মুসলমান জাতির শোষণের পথকে প্রশস্ত করেছে এবং জাতি হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্বকে খর্ব করেছে। বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঘেটে দেখলে দেখা যাবে– প্রতিটা দেশেরই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ভিত্তিমূলে আছে অন্যান্য শিক্ষার সাথে কুরআন ও হাদিস শিক্ষা। এরপর শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রয়োজনে অথবা মেধা

অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসায়-বিজ্ঞানসহ শতেক যে কোনো বিষয় নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। অথবা টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখছে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের আমখাস জনগোষ্ঠী শিক্ষা–অনীহ। বিশ্ববিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যাবার সুযোগ হয়নি। অনেকের কাছে শুনেছি, সেখানেও চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাসহ সব বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কওমি মাদ্রাসাপড়ুয়াদের এ দুর্দশা কেন? তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবসামুখী উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ কোথায়? তারা ছাত্রছাত্রীদের জন্য পেশাদারি শিক্ষা, টেকনিক্যাল শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা অকালেই জীবন ও কর্ম থেকে ঝরে যাচ্ছে। অভাবগ্রস্ত-অসহায়, বেকার, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছে। ধর্ম বিক্রি করে খাচ্ছে। অথচ আমি নিজে দেখেছি, অসংখ্য কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবিশ্বাস্য প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। পরিবেশের কারণে প্রতিভার বিকাশ হয়নি। কওমি মাদ্রাসার পরিচালকরা বা সেখানে কর্মরত শিক্ষকরা একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলেই বুঝবেন, তাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে। তারা দুনিয়াদারি থেকে (হক্কুল ইবাদ থেকে) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের জীবন, জীবিকা ও কর্ম থেকে, এমনকি এ দেশের অফিস-আদালতের প্রতিটা পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী ও নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে একঘরে হয়ে বসে আছেন। সে সুযোগে অসংখ্য নীতিহীন, অসৎ, দুর্নীতিবাজ, ইহবাদী, ভোগবাদী লোকজন অফিস-আদালতের প্রতিটা পদ ও সমাজ দখল করে নিয়েছে। তাই জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়েছে। সরকারি সম্পদ নয়ছয় হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিচারপতি শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানীর সন্তান) মুসলিম উম্মহর চিন্তাগত ও আদর্শগত পতন ও বিভাজন থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বলেন, “পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষে (মুসলমানদের জন্য) বিশেষ তিনটি শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। ক. দারুল উলুম দেওবন্দভিত্তিক শিক্ষাধারা; খ. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিকেন্দ্রিক পড়াশোনা; গ. দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার সিলেবাসকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা। যথাসম্ভব ১৯৫০ সনে আব্বাজান রাহ. কোনো সাধারণ এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের আলীগড়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, নদওয়ারও প্রয়োজন নেই; এমনকি প্রয়োজন নেই দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও; বরং আমাদের প্রয়োজন একটি তৃতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, যা আসলাফ ও পূর্বসূরিদের ইতিহাসের

ধারায় আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবে।' এমন কথা শুনে অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঁচকে ফেলবেন। দারুল উলুম দেওবন্দের নুন খাওয়া এক সুবোধ সন্তান, দারুল উলুম দেওবন্দের আস্থাভাজন প্রধান মুফতি কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন যে, পাকিস্তানে আমাদের জন্য দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার! আব্বাজন রহ.-এর এ বক্তব্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শিতাপূর্ণ। বিষয়টি না বোঝার দরুন আমাদের এখানে বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে যে তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল তা স্বাভাবিক কোনো ধারা ছিল না; বরং তা ছিল ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ধারার প্রতিফল এবং তাদের চক্রান্তের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিকল্প মাধ্যম অবলম্বন মাত্র। নতুবা ভারতবর্ষে ব্রিঠিশ সম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশের পূর্বে মাদরাসা এবং স্কুল নামের দুটি বিজাতীয় ধারার অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেন না। এতদঞ্চলে ইসলামের সূচনা থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ডের আগ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে একসাথে দীনী এবং জাগতিক দু ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।” (বর্তমান সময়ে প্রয়োজন নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা: মুফতি তাকী উসমানি। (Our iSLAM24.com; মে ২৯, ২০২১)। এতে বোঝা যায় কওমি মাদ্রাসার 'আস্থাভাজন প্রধান মুফতি'ও কওমি শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং ইহকালীন জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অকার্যকারিতা উপলব্ধি করেছেন এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছেন।

আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও ঐ একই দশা। তারাও জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা ছেড়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার না ঘটিয়ে; বিজ্ঞান, ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় উদাসীনতা দেখিয়ে ইসলামের ইতিহাস ও আরবি ভাষার ওপর একচ্ছত্র দখলদারিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা কাজির হিসাবের মতো কাগজে-কলমে আছে, গোয়ালে নেই; এখানেও– পাঠ্যসূচিতে আছে, লেখাপড়ায় নেই। বেকারত্বের গ্লানিকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে জেনেশুনে বেছে নিয়েছে। যদিও ইতিহাস বলে যে, এ দেশে ইংরেজদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের আগেও মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল। বিশ্বের অনেক মুসলিম সভ্যতায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জীবনোন্নয়নের ও সৃষ্টিসেবার পাথেয় হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসার (বাস্তবে) শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মবিমুখ ও পেশাবিমুখ শিক্ষা শুধু এ উপমহাদেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। এ উপমহাদেশে মাদ্রাসা নামের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষা বাদ দেওয়াতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটা অনুন্নত, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে ক্রমশই পর্যবসিত করে ফেলছে। সুশিক্ষিত ও মর্যাদাবান জাতি গঠনে ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টা আমাদের ইসলামি চিন্তাবিদরা, মৌলভি-

মাওলানারা আদৌ বিবেচনায় আনছেন না। এই বোধশক্তিটুকু আগে ফেরা প্রয়োজন; তারপর করণীয়। বিশ্বের অন্য সব মুসলিম দেশে এখনো শিক্ষায় ধর্মীয় ভিত আছে, আবার উচ্চশিক্ষায় গিয়ে জীবনের ও সমাজের প্রয়োজনমতো যে কোনো বিজ্ঞান-ব্যবসায় ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থা এখনো চালু করা সম্ভব। এ দেশে তেমন শিক্ষার রেওয়াজ নেই। চিন্তা-চেতনা শিকেয় তুলে রেখে দিয়েছি।

আসলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলমানেরা একটা আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিনাশী জাতি হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। এদের চৈতন্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত মানসম্মত শিক্ষায় জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত, শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক বৈশিষ্ট্য অন্তরে না আসা পর্যন্ত সারা বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশেও মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এ দেশের মানুষকে যদি পরতন্ত্র ও কতিপয়তন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন রাখতে হয়, দেশের স্বাধীনতাকে যদি অক্ষুণ্ন রাখতে হয়, তাহলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরাচারবৃত্তি ছেড়ে এ দেশের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতীয় চেতনায় অখণ্ডতা, সংহতি ও উৎকর্ষ বাড়ানো আশু প্রয়োজন। এ উপলব্ধি এ দেশের প্রতিটা সচেতন (হুজুর, নন-হুজুর) নাগরিকের থাকতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে একটু পিছপা হলেই এ জাতির ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে, কালের পরিক্রমায় টিকতে পারবে না, এটা নিরঙ্কুশ সত্য। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না থাকলে এ জনগোষ্ঠী পরিণামে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর হুকুমবরদারে পরিণত হবে– এ বোধশক্তি মগজে জোরালোভাবে ঠাঁই দিতে হবে। মৌলভি-মাওলানাদের এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে এসব বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে পথ এগোতে হবে, করণীয় নির্ধারণ করতে হবে, উপযুক্ত পথকে বেছে নিতে হবে। হাতের কাছে আফগানিস্তানের মুসলমান, ভারতীয় মুসলমান, উইঘুর মুসলমান ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে, তাদের পরিণতি বুঝতে হবে এবং নিজেদের মুক্তি কীসে সে-পথে হাঁটতে হবে।

তবলিগ জামাতের অসংখ্য ধর্মভীরু মুসলমান দেশ-বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্মপ্রচারের কাজে মন দিয়েছে। তাদের অনেকেই আমার ঘনিষ্ঠ। তাদের হাত ধরে দেশ-বিদেশের বহু অমুসলিম প্রতিনিয়ত মুসলমান হচ্ছে শুনি। সমাজের অনেকে তাদের পথ অনুসরণ করে নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত ও তসবিহ-তিলাওয়াতের কাজে রত হয়ে পরকালের পথে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য– শিক্ষা, জীবন-জীবিকা-কর্ম, সমাজগঠনকে উপেক্ষা করে চলেছে। এদের অনেকেরই চিন্তা-চেতনা ও কর্ম গোঁড়ামিতে ভরা, একদেশদর্শী।

প্রতিপালকের সৃষ্টিকর্ম, দুনিয়াদারি, সৃষ্টির সেবা, জীবনকর্ম ও পেশাকে অলীক-অসার ভেবে একেবারে মূল্যহীন-নিষ্কর্ম করে ছেড়েছে। যুগ যুগ ধরে তারা সমাজে সুশিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, হতদরিদ্র মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, আর্ত-মানবতার সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষিত সমাজগঠন ও সত্য কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, এসব কথা নিয়ে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এগুলোও 'দীনের খেদমত' ও 'হক্কুল ইবাদ'– পরকালের পাথেয়। এগুলোকে বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। এদেরকে বুঝিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুশিক্ষা, ন্যায়কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, দুঃস্থ সহায়তা ও দরিদ্র-মানবতার সেবার জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আনতে পারলে সমাজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়, একই সাথে তাদের পরকালের মুক্তিও মেলে।

এ দেশে একটা শিক্ষাসমাজ তৈরি হওয়া দরকার, যে সমাজ অদূরদর্শী, আত্মবিনাশী, পথহারা এই খণ্ডিত শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় ফিরিয়ে আনবে। ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে। ইহকালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থের সদ্ব্যবহার, সুশিক্ষা, কর্ম, পেশাগত দায়িত্ব পালনও ধর্ম ও ইবাদতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। প্রতিটা মানুষেরই ধর্ম ছাড়াও সমাজে আলাদা একটা মর্যাদাশীল পেশা থাকতে হবে, তা বোঝাবে। এই মর্যাদাশীল পেশাও যে ধর্ম-কর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। সামাজিক সুশিক্ষা ও 'মানুষের খেদমত' যে আসলে একটা মানবসেবা, যার জন্য পরকালে তারা মুক্তি পাবে, তা শেখাবে। তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি, অকর্মণ্যতা দূর করবে। পুরো জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে ভাগ করে শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। আর্ত-মানবতা ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আর্থিক সেবা দেবে। অকাতরে মানুষের কল্যাণে সম্পদ দান ও ব্যয় করবে। দেশে মানুষের মতো মানুষের বসবাস বাড়াবে।

ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম, 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?' তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। আমরা না জাগলে, বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করলে দিনের আলোর ছোঁয়া যুগ যুগ ধরে অধরাই রয়ে যাবে। আর সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দায়িত্ব পালনে জেগে উঠলে এই অমানিশার ঘোর আঁধার কেটে গিয়ে মৃতপ্রায় এই সমাজ-বৃক্ষ সূর্য-সারথি অরুণিম আলোর বর্ণচ্ছটায় আবার কচি-কিশলয়ে ভরে যাবে।

একসময় বাম রাজনীতির ধারা এ দেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাকিস্তান আমল থেকেই এটা শুরু হয়েছিল। এ দেশের সচেতন

ও মেধাবী ছাত্র-শিক্ষক-সমাজের একাংশ ও সাধারণ মানুষ এতে যোগ দিয়েছিল। উদ্দেশ্য সমাজসেবা করা; বঞ্চিত, নিপীড়িত, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করা। স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর পর এ ধারা ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। গণমানুষের মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য স্বার্থত্যাগী ও ভুক্তভোগীরা এতে ভূমিকা রেখেছিল। আমি তখন কলেজপড়ুয়া ছাত্র। বন্ধুদের সংস্পর্শ আমাকেও এ ধারার সমাজসেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সবই ভালো। শুধু ধর্মের বিষয়ে মনের মধ্যে দোদুল্যমানতার কারণে তখন সরাসরি দলে যোগ দিতে পারিনি। কিছুদিনের মধ্যেই বামধারার রাজনীতির মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতার বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। বামদলগুলো ভাঙতে ভাঙতে ব্রাকেটসর্বস্ব হতে থাকলো। ক্ষমতাসীন দলের দমন-পীড়ন শুরু হয়ে গেল। প্রভাবশালী অনেক নেতাই দলীয় আদর্শকে মনে মনে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লো। অন্তরে-প্রকারান্তরে বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে গেল। দলের মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। দলীয় কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হতে থাকলো। ক্রমান্বয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে বাম রাজনীতির মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন বিদায় নিলো। শেষ বিদায়ের মৃদু রক্তিম রশ্মির চিক্কণ মনোহর ছোঁয়া এ দেশের পশ্চিম গগনের অধরেও কিঞ্চিত ধরা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল। বাম নেতারা দলে দলে অন্য ডান দলে অনুপ্রবেশ করতে লাগলো, যেন 'সংসার-বৈরাগী হতে গিয়ে সংসারী হয়ে পড়েছি'। প্রতারিত ত্যাগী কর্মীরা বিনা প্রতিবাদে মনের দুঃখ মনে নিয়ে যার যার পথে রুজি-রোজগারের কাজে নেমে পড়লো। অনেক ত্যাগী কর্মীর সাথে চলতি পথে এখনো দেখা হয়। ভালো-মন্দ আলাপচারিতা হয়। দেখি তাদের মধ্যে আর্ত-মানবতার সেবা, মেহনতি মানুষের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মনোভাব এখনো বিদ্যমান। পার্থক্য এটুকুই যে, যেসব নেতা-কর্মীরা ধর্মকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে ধর্মহীন বাম-রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল, তাদের অধিকাংশই এখন সময় অতিক্রমণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ভুলে গিয়ে নামাজ-রোজার আস্তিক মোড়কে নিজেদের পরকালকে সংরক্ষিত করে চলেছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী আট বছরের কোনো এক সময়ের একটা গল্প বলি। আমাদের বাড়ি থেকে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরের একটা ঘটনা। ঐ এলাকায় আমাদের একঘর আত্মীয় আছে। তাদের পাশের গ্রামের এক বনেদি চাষি পরিবার। চাষির বয়স হয়েছে। ছয়-সাতটা ছেলে-মেয়ে। ছেলেগুলোকে চাষকাজ শিখিয়েছে। মাঠে চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘে জমি। এলাকার একটা পক্ষের চোখ ঐ জমির ওপর পড়েছে। চাষির নামের সাথে বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া লেবেল এঁটে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে চাষিকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। চাষিকে উড়ো

চিঠি দিয়েছে। একদিন ঐ চাষি সকালে উঠে বাড়ির পাশের একটা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে টয়লেট করতে বসেছে। পিছন থেকে দুজন লোক এসে তাকে রাইফেল তাক করে গুলি করতে গেছে। অনেকবার চেষ্টা করেও রাইফেল থেকে গুলি বের হয়নি। চাষি ঝরা পাতার খস্-খস্ শব্দে পিছনে তাকিয়ে দেখে দুজন লোক তাকে গুলি করার চেষ্টা করছে। প্রাণের মায়া কার না আছে! চাষি বুঝতে পেরে সেখান থেকেই 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। চাষির কয়েকটা ছেলে লাঠি নিয়ে সেদিকে ছুটে গিয়ে দেখে লোকগুলো পালাচ্ছে। ছেলেগুলো লাঠি নিয়ে পিছু ধাওয়া করলে তারা বাম রাজনীতির স্লোগান হাঁকতে থাকে। একটা ফাঁকা গুলি ছোড়ে। তারপর পালিয়ে যায়। চাষি নির্ঘাত মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পায়।

চাষির অপরাধটা নিয়ে ভাবছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হওয়া ও চাষে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিছু জমিজমা কেনা কি কোনো অপরাধ? যারা রাজনীতির ধুয়ো তুলে, সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে রাজনীতির নামে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ গম, কম্বল, নগদ অর্থ লুটপাট করে জনকোষাগার নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তাদের চেয়েও কি চাষির অপরাধ বেশি? চাষি মারা যাবার পর ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমি ভাগ-বাটোয়ারা হলেই ভাগের-ভাগ জমি দশ বিঘের বেশি হবে না। তখন কি ঐ পরিবার পেটি-বুর্জোয়ার খাতা থেকে নাম কাটিয়ে সাধারণ মানুষের খাতায় নাম উঠাবে? রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে নিয়ম করে দিতে পারে যে, প্রতিটা পরিবার সর্বোচ্চ এত বিঘে জমির বেশি রাখতে পারবে না। তখন হয়তো ঐ চাষি জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু সমাজের কয়টা লোক বিচ্ছিন্ন কয়েকটা লোকের মুখের কথায় নিজস্ব সম্পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে? আর জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ কিছু সম্পদ ত্যাগ করলেই কি দেশের নিয়মে কোনো পরিবর্তন আসবে? তার জন্য তাকে বিনা বিচারে জীবন দিতে হবে– মানবিক বিচারে এ-কাজ কতটুকু সমর্থনযোগ্য? এভাবে বিনা অপরাধে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোককে খুন হতে হয়েছে।

এমনই নানা ধরনের লক্ষ লক্ষ 'অনৈতিক অপরিণামদর্শী কাজ' বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের নামে মানব সভ্যতায় কেউ কেউ চাপিয়ে দিয়েছে ও এখনো দিচ্ছে। যেমন– 'বাংলা ভাই' গংদের পিঠে বোমা বেঁধে জেলা পর্যায়ের নিরপরাধ বিচারকদের হত্যা। জেলা পর্যায়ের নিরপরাধ বিচারককে মেরে ফেললেই যে দেশে বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না– এ বোধ ও শিক্ষা বাংলা ভাই গংয়ের থাকা জরুরি। তেমনি সারা দেশে একই সময়ে একসাথে বিশ-পঞ্চাশটা বোমা ফাটাতে পারলেই কোনো নতুন বিধান কায়েম করা যায় না। এগুলো মানসিক বিকারগ্রস্ত কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ছাড়া মানব সভ্যতা ও

সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মানবতাবাদী 'সবার উপরে মানুষ সত্য' চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ কী বলবেন? মানুষের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র ও সৃষ্টির এত আয়োজন। স্রষ্টার এ খলিফাকে প্রচলিত আইনে বিচার না করে অন্যায়ভাবে নিধন করার মতবাদকে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কোনো লোকই মেনে নিতে পারে না।

কপালের লিখন, মাঝবয়সে আমার পূর্ব-ইউরোপের কার্ল মার্কস ইউনিভার্সিটিতে (পরিবর্তিত নাম: করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট) অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সুপারভাইজারকেও পেয়েছিলাম বাম ভাবধারায় পুষ্ট যুদ্ধক্লান্ত পরাজিত শিক্ষাগুরু। তাঁর হাত ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কালিমামাখা বাম রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। তাঁর কাছ থেকে ভিতর-বাইরের অনেক কথাই জেনেছি। নিজের অহিংস মানবতার ধর্মের কথা বলেছি। নিজের মনের কাছে বার বার প্রশ্ন করেছি, এমনটি হলো কেন? বাম রাজনীতির পতনের গূঢ় রহস্যটা কী?

দেশে এসেও বিষয়টা নিয়ে অনেকবার ভেবেছি। শিক্ষা ছাড়া মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না, অন্যান্য প্রাণিতুল্য হয়ে যায়। ধর্মের মূল কথাও মানবতার মুক্তি। শিক্ষাই মানুষকে সভ্যতার স্পর্শ দিয়ে, মানবতাবোধ দিয়ে, কোড অব এথিক্স দিয়ে, সমাজবদ্ধ হয়ে, রাষ্ট্র গঠন করে বাঁচার মতো বাঁচতে শিখিয়েছে। তাই শিক্ষায় সততা, নৈতিকতা, মানবতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকা অপরিহার্য। সততা, নৈতিকতা ও মানবতার আদর্শ যদি কোনো মতবাদের মধ্যে নিহিত না থাকে, সে মতবাদ সময়ের পথ-পরিক্রমায় ধোপে টেকে না, টেকসই হয় না। কেউ অন্যায়-অপরাধ করলে তার জন্য রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা আছে। যে মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র, মানুষই যেখানে সর্বেসর্বা, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিগড়ে বেঁধে, মানুষকে বিভক্ত করে, সেই মানুষের নিধনযজ্ঞ চালিয়ে মানবতার মুক্তি আসে না। মতবাদ তখন অকেজো হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক বিভক্তি সমাজে প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিও সময়ের ব্যবধানে আপেক্ষিক। বাম রাজনীতির রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের অনেক ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে সংশোধিত মডেলে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো ও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতো বলে আমার বিশ্বাস। তবে সেখানে সততা, নৈতিকতা, শিক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শ থাকা জরুরি ছিল। এগুলো সামাজিক দ্বন্দ্বকে মিনিমাইজ করে।

বাম রাজনীতির মূলতত্ত্ব এখন বিশ্বের শাসনব্যবস্থা থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। সময়ের পথ পরিক্রমায় এখন সবই দীর্ঘশ্বাস। সমাজসেবা ও মেহনতি মানুষের

জন্য আত্মত্যাগে উজ্জীবিত অনেকেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আবার অনেকে এ সমাজেই বিভিন্ন পেশায় রয়ে গেছে। এদের অনেকের মনে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির নেশা, মানবতার ধর্ম রয়ে গেছে। তাদেরকে সমাজসেবা ও শিক্ষিত জাতি গড়ার আদর্শে আবার জাগিয়ে তুলতে পারলে তারাই শিক্ষিত সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারে।

সমাজে আরো কিছু পক্ষ আছে। তাছাড়া সমাজে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ আছে। এদের মধ্যে একটা শ্রেণি হচ্ছে চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ। এর একটা অংশ সুশিক্ষিত যারা সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন সংস্থায়, সামরিক বাহিনীতে কর্মকর্তা পদে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা থেকে সমাজ সেবা পেতে আশা করে। সারা দেশের আনাচে-কানাচে এরা ছড়িয়ে আছেন। তাদের অনেকে জীবনের পড়ন্ত বিকেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে চান। সমাজে এরা শ্রদ্ধেয়। শিক্ষা সমাজ এদেরকে চায়। শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এদেরকে খুঁজে খুঁজে সমাজ উন্নয়নের কাজে ভেড়ানো দরকার। একটা নীতিমালা হাতে তুলে দেওয়া দরকার।

সমাজের পরতে-পরতে আরেকটা পক্ষও মিশে আছে, যাদের শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। সমাজ এদের কথা এখনো নেয়। এদের একটা অংশ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে আত্মমর্যাদা ভুলে বিপথে গেছে। বাকিরা তো ঠিক পথে আছে। সমাজে এরা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ-শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে। এদের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, নতুন নতুন ভাব-ধারণা (আইডিয়া), দিক-নির্দেশনা দিয়ে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, সমাজের মানুষকে সুশিক্ষা দিতে পারে। আমার বিশ্বাস, সুষ্ঠু পরিবেশ ও সমাজগঠনে অনুকূল পরিবেশ পেলেই এরা এগিয়ে আসবে।

বয়সভিত্তিক আরেকটা পক্ষ আছে, যারা যুগে যুগে সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে আসছে, যাদেরকে এ দেশের কলুষিত রাজনীতি স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ব্যক্তিস্বার্থের লোভনীয় মোয়া হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বর্ণালি অতীতের ত্যাগের মহিমাকে কলঙ্কিত করেছে। এরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। কোনো পিছুটান নেই বলে প্রাণের মায়া এদের কাছে তুচ্ছ। সত্যের প্রতি অবিচল। এরা প্রগতিশীল সুশিক্ষিত সমাজ-সংগঠক। এদেরকে সরাসরি সমাজসেবার কাজে লাগানো যায়। সমাজে আরো একশ্রেণির মানুষ আছে

যারা নিজের এলাকায় থেকে চাকরি করে, ব্যবসা করে। কোনো রাজনৈতিক কলুষতার সাতে-পাঁচে নেই। এরাও সমাজগঠনে এগিয়ে আসতে পারে।

সুশিক্ষা ও সুস্থ সমাজ গঠনকে যদি আমরা একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করি, বিভিন্ন সমাজ-সংগঠনকে যদি এ-লক্ষ্যে ব্যবহার করি– এ দেশে সামাজিক সুশিক্ষার অভাব হওয়ার কথা না। অল্প কিছু ধর্মবিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও তাদের চেলা-চামুণ্ডা বাদে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু। সুশিক্ষা দিলে তারা শিক্ষা নেয়। পরিবেশ নষ্ট করেই-না আমরা মনুষ্যত্বের সবটুকু হারিয়ে ফেলেছি, মানুষ নামের কলঙ্ক হয়ে গেছি। এখন থেকে কোনো সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সমাজসংগঠন চেষ্টা করলে, রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অনেক অল্প সময়ে সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

আরেকটা পথের কথা বলি। প্রতিটা বিষয়ের অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে সামাজিক সুশিক্ষা, সমাজগঠন, সমাজসেবা, মানবসেবা, সমাজউন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে আনতে পারি। প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে সে-মতো ব্যবহারিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারি। তারা লেখাপড়া শেষে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে গেলে সমাজ উন্নয়নের জন্য তখন জনবলের অভাব হয় না। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয়, প্রতিটা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' নামে বিষয় পড়ানো হয়। সেখানে পাঠ্যসূচিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'-এর ধরন-ধারণ, প্ল্যানিং শিখতে হয়। সেখানে তো এর সাথে একটা দেশের 'হিউম্যান রিসোর্স' গঠন, রিসোর্স গঠনের উপাদান, রিসোর্স বৃদ্ধির উপায়, প্ল্যানিং, স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ও নিয়ন্ত্রণসহ আরো অনেক বিষয় শেখানো যায়। এতে দেশে 'হিউম্যান রিসোর্স' গড়ে ওঠে। দেশও উপকৃত হয়।

এ দেশে টাকা-পয়সা ও সম্পদের তো কোনো অভাব নেই। সম্পদের বিরাট অংশটাই রাজনীতির মদদপুষ্ট দুর্নীতিতে পারদর্শী বিশেষ একটা শ্রেণির হাতে জমা হয়েছে। অভাব সুন্দর একটা টেকসই ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের। অভাব মানবসম্পদের, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ও সুশিক্ষার।

এ দেশের প্রতিটা মাঝারি থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ আছে। তাদের সদস্যদের নিয়ে অনেকগুলো সমিতিও আছে। তাদের কর্মকাণ্ড স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোকবল উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। 'শিক্ষা- সেবা সমাজ' তাদের সহযোগিতা নিয়ে সমাজে কাজ করতে পারে। এতে সমাজ

দারুণভাবে উপকৃত হয়। এ সবকিছুর জন্য দরকার সরকারের যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। সর্বোপরি সরকার ইচ্ছে করলে পুরো দেশের মানবসম্পদের বাঞ্ছিত উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গঠন করতে পারে। এর আওতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারে। তাহলে পরিকল্পিতভাবে সমাজউন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। এটা সময়ের দাবি। তবে নামের আগে ‘সরকারি’ শব্দটার যোগ থাকাতে এর কার্যকারিতা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যত সন্দেহ ও ভয়। এ ভয়ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে দূর করা সম্ভব।

এছাড়া সমাজের কোনো পক্ষেই নেই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ। পরিশ্রম করে বেঁচে থাকা, টিকে থাকাই এদের মতবাদ। সমাজের কল্যাণে এবং সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ভালো কাজ করলে এরা তখন একটা পক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এরা সে-কাজকে নির্দ্বিধায় ও কায়মনোবাক্যে সমর্থন করে। তাতে কর্মপ্রক্রিয়া বেগবান হয়, সমাজের স্বীকৃতি পায়, সমাজে স্থান করে নেয়। শিক্ষাসমাজ এদেরকে সমাজ-সেবা কর্মের মাধ্যমে কাছে নেবে, সাথে নেবে। অর্থাৎ ভালো কাজের উদ্যোগ থাকলে, ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের মহিমায় অবিচল থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা থাকলে সাধারণ মানুষ ওয়ার্ক গ্রুপ-এর পাশে থাকে। সেজন্য চেষ্টা করলে সুশিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল সমাজ-সংগঠন তৈরি করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

৩.

শিক্ষা ও সেবায় ধর্মের প্রায়োগিকতা ও ধর্ম-কর্ম

এ দেশের মানুষ কমবেশি ধর্মভীরু। সেই আদিকাল থেকে এ দেশের সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজব্যবস্থার প্রতিটা কর্ম ও সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে ধর্মীয় উপাদানের সার্থক প্রয়োগ উক্ত কর্ম ও সিস্টেমের সফলতা অনেকটাই নির্ভরশীল।

এ দেশের প্রতিটা আস্তিক মানুষ ইহকাল ও পরকালকে নিয়ে ভাবে– কেউ বেশি, কেউ কম। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে চায়। আস্তিক ধর্ম-উদাসী মানুষকে নিয়ে বেশি অসুবিধা হয় না; যা বোঝানো যায়, তাই বোঝে। ধর্মজ্ঞান তাদের কম। কিন্তু অনেক ধর্মভীরু মৌলভি-মাওলানাদের কাছেই সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার নয়। তারা জীবনের উদ্দেশ্যকে পরকালের জন্য অল্প কিছু কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে। ইহকালের কল্যাণ কীসে তা বোঝে না, ইহকালের কল্যাণ ছাড়া যে পরকালের কল্যাণ সম্ভব নয় তা বোঝে না। ইহকালের সামগ্রিক শিক্ষা ও কর্ম অলীক-অসার ভেবে শুধু পরকালের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চায়। পরকালের কল্যাণ কীভাবে অর্জিত হয় তাও বোঝে না। নামাজ, রোজা, হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বেহেশতে যাবার সোজা-সাপটা পথ খুঁজে বের করার বুদ্ধি করে ফেলে। সে মতো সাধারণ মানুষকে কর্মহীন শিক্ষা ও কর্মহীন জীবনের দিকে ধর্মীয় আবেগ দিয়ে টানে। কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করে, না বুঝে, নির্দেশনা মোতাবেক কর্ম না করে পরকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কুরআনের ইহকালীন কর্মজীবনের সামাজিক বিশ্লেষণ না করে শুধু বেহেশতমুখী ব্যাখ্যা দেয়। হক্কুল্লাকে বোঝে, হক্কুল ইবাদকে বোঝে না। পরিবার, সমাজ ও মানবসেবা হলো হক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক– এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতেও অপারগ। জীবনকর্মকে উপেক্ষা করে শুধু বিশ্বাসের ওপর ভর করে পরকালের কল্যাণ কামনা করে। আংশিক, অগভীর শিক্ষা ও ধর্মদর্শন, সৃষ্টিদর্শন বোঝার অক্ষমতা, কুরআন বিশ্লেষণের অক্ষমতা এর জন্য দায়ী। বলা হয়েছে, ‘তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে?’ (মুহাম্মাদ, ৪৭:২৪)। কুরআন বোঝার মতো উচ্চশিক্ষা নেই, সামাজিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসা নেই, অনুভূতি নেই; মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা নেই, চিন্তা-গবেষণার সক্ষমতাও নেই। আরো বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা যারা কমন সেনসকে

(আল্লাহপ্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান/বোধশক্তি) কাজে লাগায় না।' (আন্ফাল, ৮:২২)। কুরআনের অসংখ্য বর্ণনা যে খোদা নির্দেশিত পথে ইহকালীন কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনা তা আমরা এড়িয়ে যাই। কুরআনের সামান্য অংশ জুড়ে পরকাল, আর অধিকাংশ বিষয়ই যে ইহকালীন সৃষ্টি জগৎ, নির্দেশিত কাজ, পথ ও পাথেয়, সেটা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি।

আমি ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম, ইসলামি স্কলারদের লেখাপড়ার মান ভালো। সৃষ্টিদর্শন, সমাজদর্শন ও কর্মদর্শন নিয়ে তাদের দিকনির্দেশনা ও লেখালেখি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়– তাদের লেখালেখি, বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষ পড়ে না, জানেও না। এরা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। সাধারণ মৌলভি-মাওলানারা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে আছে। এদের গৎবাঁধা ধর্মীয় কথা সমাজের মানুষ মেনে চলে। দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে ও মানতে মানতে সমাজের অভ্যন্তরে কিছু বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুভূতি বিশেষ মনোজাগতিক আবেগময় রূপ পেয়েছে। ফলে নির্মোহ-বাস্তবমুখী চিন্তাধারার গলদটা রয়ে গেছে। আমরা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, কর্ম ও ভাবনার গণ্ডি এই উপমহাদেশে সংকীর্ণ করে ফেলেছি। আমি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের অনেক মুসলমানের সাথে মিশে দেখেছি, কথা বলেছি। তারা ধর্ম মানুক আর না মানুক, ধর্মের বিধি-বিধান ও কর্মকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সাধারণ সকল কাজের মধ্যে অনুভূতি দিয়ে মনের গভীরে গেঁথে নিতে পেরেছে। আমরা ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইসলামি পারিভাষিক অনেক শব্দ ধর্মীয় আবেগ মিশিয়ে ভাবতরঙ্গ তৈরি করি, ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ব্যবহার করি এবং মনের মধ্যে সেভাবে উপলব্ধি করি, যদিও এসব শব্দের আওতা ব্যাপক; মানুষের সাধারণ কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত। এসব শব্দ আমাদের মনে শুধু ধর্মের বিষয়ে গেঁথে-যাওয়া আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ফলে আমরা বাস্তব জীবনে শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারিনে। শব্দগুলো দিয়ে আমরা বাস্তব জীবনের কিছু বুঝিওনে। সে মতো চলতে পারিনে, কাজও করতে পারিনে। সমস্যাটা আমাদের ধর্মের প্রতিভূদের (প্রতিনিধিদের) নিয়ে। তারা ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, বক্তৃতায় ভাবের আবেশ মিশিয়ে সুর করে কথা বলে আবেগাপ্লুত মুসলমানদেরকে কল্পনার জগতে ইহলোকেই বেহেশতের স্বাদ গ্রহণ করান। ইহকালের পথ ও পাথেয় এবং কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা কম। সংক্ষিপ্ত পথে বেহেশতে যাবার নুসকা (ব্যবস্থাপত্র) বাতলান। ধর্ম মানে যে ইহকালীন কর্মবিধান ও চিন্তা-চেতনা তা উপেক্ষা করেন। কথায় কথায় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ফতোয়া জারি করেন। যারাই ইসলাম ও কুরআনের জীবনবিধান নিয়ে সামগ্রিক ব্যাখ্যা দিতে গেছেন

তাদেরকে অজ্ঞানতাবশত কখনো মুরতাদ (স্বধর্ম, স্বমত বা স্বদল ত্যাগ করেছে এমন) বলতেও দ্বিধা করেননি। তারা কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা ছেড়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন কুরআন-হাদিসের দৈনন্দিন কর্মজীবনে ও সমাজজীবনে প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দিতে। অথচ কুরআন নিজেই নিজেকে 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়, কুরআনে মোট আয়াত সংখ্যার মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের আলেম-ওলামাদের বিজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ, কর্মজীবন, পেশা, পথ ও পাথেয় বিষয়ে শিক্ষায় আরো মনোযোগী হতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ বিষয়গুলো প্রচার করতে হবে। তার আগে তাদের ধর্মের সামাজিক ব্যবহার ও কর্মজগৎ, সৃষ্টিদর্শন নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। তাদের নিজেদের ভালোর জন্য সকল শ্রেণির মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ধর্মের সকল কর্মভিত্তিক প্রায়োগিক শিক্ষা আনতে হবে; পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। সৃষ্টিদর্শন ও কর্মদর্শন বুঝতে হবে; নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে। তাদের অগভীর জ্ঞানকে অজ্ঞতাবশত জাহির করতে গিয়ে (হামবড়া ভাব দেখাতে গিয়ে) নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিভক্তি, দ্বন্দ্ব, হানাহানি, দলবাজি বন্ধ করতে হবে। 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' কথাটা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের কুরআন-হাদিসের জীবনমুখী শিক্ষা এবং এর সামাজিক বিশ্লেষণ শেখাতে হবে।

মূলত কোরআন দুটো কাল বা সময়কে নিয়ে সবিস্তার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে: এক. ইহকাল; এবং দুই. পরকাল। ইহকালের পুরোটাই কর্মজগৎ ও চিন্তাজগৎ। ইহকালের সৃষ্টিজগৎ, জীবন ও জীবনকর্ম পুরোটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আছে বলেই মানুষ ইহলোকে টিকে আছে। পরকালের পুরোটাই ইহকালীন কর্ম ও চিন্তাধারার ফল পাবার জন্য পরকালের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস। সৃষ্টিজগৎ পুরোটাই বিজ্ঞান– এটা মানতে কারো বাধা নেই। কিন্তু জীবন ও জীবনকর্ম বিজ্ঞান হয় কী করে– এটাই প্রশ্ন। মানুষের জন্মপ্রক্রিয়াটা বিজ্ঞান। জন্ম নেওয়ার পর থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে প্রতি মিনিট বাঁচতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত প্রণালী নিখাদ বিজ্ঞান। মানবদেহ, দেহের কার্যপ্রণালি, কোষ, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় প্রভৃতি সবটুকুই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে থাকা বিজ্ঞান। এক পা ফেলতে পা মাথার উপরে উঠে যাচ্ছে না, বা মাথা মাটিতে নেমে আসছে না– এগুলো আসলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির খেলা, যা সবটুকুই বিজ্ঞান। প্রাণি উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখেছে, উদ্ভিদ প্রাণিকে বাঁচিয়ে

রেখেছে। পারস্পরিক বেঁচে-থাকা ও নির্ভরশীলতার সবটাই স্রষ্টার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অথচ আমাদের কিছুসংখ্যক মাওলানা (শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ) বা আলেম (জ্ঞানী) আল্লাহর এসব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বা আল্লাহ-সৃষ্ট প্রাকৃতিক কর্মপ্রণালী নিয়ে একটুও ভেবে দেখেন না। বিজ্ঞান জানেনও না, বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া জীবন পরিচালনা অসম্ভব, এটা ভেবে সে মতো কাজ করেন না। সৃষ্টিদর্শন ও জীবনদর্শন নিয়ে ভাবেন না। দুনিয়াদারি জীবন-পেশা-কর্মব্যবস্থা বুঝতে চান না। না-জেনে না-বুঝেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন, সৃষ্টি ও কর্মপ্রণালীর সোজা-সাপটা উপরিগত মুখস্থ ব্যাখ্যা দেন। দুনিয়ার জীবনযাপন ও কর্ম বাদ দিয়ে শুধু বিশ্বাসের ওপর ভর করে পরোকালে ভালো প্রতিদান আশা করেন। সাধারণ মানুষকে সে-ভাবে চালান। ইসলামকে শুধু পরকালের জন্য ইবাদত-বন্দেগির আনুষ্ঠানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেন। এটা বাস্তবসম্মত নয়। এখানেই গোলমালটা বাধে। তাই বলতে হয়, কোরআনে বর্ণিত সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও এর কর্মপ্রণালীর সবটুকুই ধর্মের অন্তর্গত– এই সামুদয়িক (অল ইনক্লুসিভ) ব্যাখ্যা যতক্ষণ ইসলামধর্মকে নিয়ে না দিতে পারি এবং ধর্মশিক্ষার আওতা কোরআনে উল্লিখিত সমুদয় সৃষ্টি, জীবন ও কর্মপ্রণালি ও এর ভালো-মন্দ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ শিক্ষা) বলে গ্রহণ করতে না পারি এবং সে মতো কর্ম করতে না পারি, ততক্ষণ ‘ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান’ বললে চিন্তা, কথা ও কাজে গরমিল ধরা পড়ে। এটা কোনোমতেই কাম্য নয়। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষায় সকল পেশাজীবী তৈরির শিক্ষা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দুনিয়ার সকল শিক্ষা-কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও সে বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল শিখি, পরকালে সফলকাম হতে চেষ্টা করি– এটাও অবাস্তব ও অবান্তর। স্রষ্টার দেখানো পথে দুনিয়ার সকল চিন্তা, পেশা ও কর্মই ধর্ম ও ইবাদত। পরকালে কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই, ইবাদতও নেই; শুধু ফলাফল প্রাপ্তি এবং অনন্ত জীবনযাপন।

আমি একজন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস মোতাবেক শিক্ষা দেওয়াই আমার কাজ। নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি ছাত্রছাত্রীকে শেখাই। বিভিন্নভাবে শিক্ষা নেওয়াটা ও আমার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করাটাই ছাত্রছাত্রীদের মূল দায়িত্ব। যে যত ভালোভাবে মূল দায়িত্ব পালন করে, পরীক্ষায় তার ফলাফল তত ভালো হবার সম্ভাবনা। কে পাস করবে, কে ফেল করবে আমি তা আগেই বলে দিতে পারি। কে পরীক্ষায় বেশ ভালো করবে তাও বলে দিতে পারি। তবু পরীক্ষা একটা পদ্ধতি ও ডকুমেন্টেশন। পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পরে আর কোনো পড়াশোনা ও শেখার দায়িত্ব নেই। শুধু ফলাফলের জন্য অপেক্ষা। ফলাফল হয়তো ভালো, নয়তো খারাপ। ফলাফল পরীক্ষার আগের কাজের ভিত্তি। লেখাপড়া ঠিকমতো

করবো না, শিখবো না, করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারেকাছেও যাবো না, আবার ভালো ফলাফলের আশা করবো। ছাত্রছাত্রীরা মূল কাজ না করে, শিক্ষকের নির্দেশনা মতো না চলে শুধু ইনিয়ে-বিনিয়ে শিক্ষকের অনুকম্পা লাভের চেষ্টা (শিক্ষক, আপনার দয়া চাই। আপনি ইচ্ছে করলেই পাস করিয়ে দিতে পারেন।) করলে কতটুকু সফল হয়? শিক্ষা প্রক্রিয়া ও কর্মকে বাদ দিয়ে, পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে ভালো ফল পেতে চেষ্টা করা কতটুকু যৌক্তিক? এটা বাতুলের প্রত্যাশা মাত্র। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে আমরা মূলত তাই-ই করছি।

আমি সামাজিক শিক্ষা, সমাজগঠন ও সমাজকর্ম, সৃষ্টিসেবা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার করতে চাই। এ দেশকে গড়তে গেলে, উন্নয়নের প্রেক্ষাপট রচনা করতে গেলে, এ দেশকে টিকিয়ে রাখতে গেলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থাকে বেছে নিতে চাই। কর্মবিমুখ ও পেশা/বৃত্তিবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও সৃষ্টিসেবার উদ্দেশ্যে জীবনের কর্মে ও সমাজের কর্মব্যবস্থায় ধর্মের প্রায়োগিকতা দেখতে চাই। ইহকালীন জীবনযাপন, পেশা/বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সমাজগঠন, সমাজকর্ম, সমাজসেবা, সমস্ত ন্যায় কাজ ও কল্যাণের মধ্যে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে পরকালের কল্যাণ ও মুক্তির পথ খুঁজবে এমন একদল অহিংস আস্তিক মানুষ পেতে চাই। তাদেরকে 'ধর্মই কর্ম' বা 'কর্মই ধর্ম' (সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)− এই নীতিতে বিশ্বাসী পেতে চাই। তারা যে কোনো ধর্মের হতে পারে বা সম্মিলিত মানবগোষ্ঠীর হতে পারে। এজন্য আমি একজন মুসলমান হিসাবে আমার ধর্মগ্রন্থ থেকে অতি সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ধর্মের আওতা, শিক্ষার আওতা, মানবকল্যাণ, মানুষের কর্ম-পেশা, আমল, ইবাদত (দৈনন্দিন জীবনে ও সব কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল চিন্তা ও কাজ করা) বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অল্প কথায় কিছু বলতে চাই, যাতে ইহকালীন কর্মজীবন ও চিন্তাধারাই যে পরকালের মুক্তির পথকে নিরূপিত করে তা পরিষ্কার হয়। অন্য ধর্মগ্রন্থ খুঁজলেও, আমার বিশ্বাস, এ ধরনের অনেক দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। আমার অন্য ধর্মজ্ঞান নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখাপড়াও নেই। কিছু কথা বিজ্ঞান জানা ও ধর্ম নিয়ে গবেষণা করা ব্যক্তির বিশ্লেষণ থেকে ও তাদের করা কোরআনের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি। এখানে আলোচনায় 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত 'আল কুরআন- যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ব্যবহার করছি।

পৃথিবীতে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষকে খলিফা করে পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আর যখন তোমার প্রতিপালক বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি; তারা বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা (উপাসনা) করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানো না।’ (আল বাকারাহ, ২:৩০)। অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন;... ।’ (আন্ আ’ম, ৬:১৬৫)। এতে বোঝা যায়, প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং মহিমা ঘোষণা (উপাসনা) করা ছাড়াও আরো অনেক কাজ খলিফাকে করতে হবে। কারণ প্রতিনিধিকে ঘরে বসে শুধু মহিমা ঘোষণার জন্য নিযুক্ত করা হয় না। তাকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বটা কী? দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এরং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফল।’ (আলে ইমরান, ৩: ১০৪)। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে ‘এমন একটা দল’ থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। এখানে মানুষের কাজের মূল নির্দেশনা বলা হয়েছে কিছু কাজের আদেশ এবং কিছু কাজের নিষেধ। কাজ না করলে আদেশ-নিষেধের প্রশ্নই আসে না। মূল দায়িত্বটাই হলো মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) অনুযায়ী কাজ। খলিফা নিজেও ভালো কাজ করবে, আবার অন্যকেও করতে আদেশ করবে। নিজেও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, অন্যকেও বিরত থাকতে বলবে। কাজকে বাদ দিলে জীবন ও জীবিকা চলতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসও সম্ভব হয় না। সৃষ্টির উদ্দেশ্যও সফল হয় না। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘আর প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুসারে; আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।’ (আল আহকাফ, ৪৬:১৯)। এক আয়াতে খুব সহজ ভাষায় জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কর্ম নিয়ে বলা হয়েছে, ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের (এ বিষয়ে) পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম; আর তিনি মহাপ্রতাপশালী ও অতি ক্ষমাশীল।’ (আল মুলক, ৬৭:২)। এতে বোঝা যায়,

কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্যই জীবন এবং মৃত্যুর পর কর্মফল। যার সৃষ্টির কল্যাণে কর্ম নেই, তার কর্মে উত্তম-অধম চেনার কোনো ব্যবস্থা নেই– পরকালে কল্যাণ প্রাপ্তির কোনো আশাও নেই। আরো অনেক আয়াতেও এসব কাজের কথা বলা হয়েছে। আবার কোরানের অসংখ্য জায়গায়ও এই 'কল্যাণ'-এর কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, কল্যাণ কোন কোন কাজে আছে? তাও বলা হয়েছে, 'তাদের অনেক গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে তারা (গোপন পরামর্শ ব্যতীত) যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়; আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অচিরেই আমরা মহাপুরস্কার দেবো।' (আন নিসা, ৪:১১৪)। এখান থেকে বোঝা যায়, কল্যাণ আছে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশে। তাহলে পরকালের মহাপুরস্কারের জন্য আমাদের দরকার আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকল ভালো কাজ (ভালো কাজকে শ্রেণিবদ্ধ করলে পেশা/বৃত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়) করা ও মীমাংসার নির্দেশ। অর্থাৎ আবার সেই 'কাজ'-এর নির্দেশনা (দান–খয়রাতও একটা বিশেষ কাজ) দেওয়া হয়েছে। আমরা দুনিয়াতে এই সৎচিন্তা ও সৎকাজের ক্ষেত্রেই বড্ড পিছিয়ে যাচ্ছি।

নামাজ কায়েমের মধ্যেও কল্যাণ আছে। নামাজ কায়েমকে বলা হয় সবচে বড় ইবাদত। প্রশ্ন আসতে পারে নামাজের উদ্দেশ্য কী? বলা হয়েছে, 'তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহি করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো (সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করো); সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ; আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।' (আল আনকাবুত,২৯:৪৫)। তাই আল্লাহর স্মরণই (জিকর) শুধু নামাজের উদ্দেশ্য নয়, দুনিয়ার সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে খলিফাকে বিরত রাখাটাও নামাজ কায়েমের উদ্দেশ্য। এখানেও সেই কাজ (আমল); কাজ ছাড়া দুনিয়ার জীবনযাপন অচল। অর্থাৎ নামাজের মধ্যেও মানুষকে 'কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে' নির্দেশনা বিদ্যমান।

কুরআনে আরো বলা হয়েছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো ও আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।' (আল বাকারাহ, ২:২০১)। একজন মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তার শেখানো এই দোয়া করবে, তখন দুনিয়ার কল্যাণ কীসে হয় তা তাকে জানতে হবে। এ দুটো আয়াতকে একসাথে পড়লে বোঝা যায়, সকল সৎকাজে দুনিয়ার

কল্যাণ। কীভাবে কল্যাণ অর্জন হয় তাও তাকে বুঝতে হবে, চর্চা করতে হবে। এখানে পরকালের কল্যাণের আগে দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। এরও একটা গূঢ় তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। কোন কোন কাজে দুনিয়ার কল্যাণ, তা জানা ও বোঝাটা জরুরি। আমরা এটা ভেবে দেখিনে কেন? দুনিয়ার অস্তিত্ব ও কর্ম আছে বলেই পরকাল আছে, এটা বুঝতে চাইনে কেন? দুনিয়ার কর্মকে অস্বীকার করা মানে প্রতিপালকের দুনিয়া-সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝতে না পারা, পরকালের মুক্তির পথকে সংকুচিত করে ফেলা। বলা হয়েছে, 'আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা এ দুটি অযথা সৃষ্টি করিনি কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' (আদ্ দুখান, ৪৪:৩৮,৩৯)। কুরআনের এ আয়াত ও এমন আরো অসংখ্য আয়াতে প্রমাণ দিচ্ছে যে, পৃথিবী সৃষ্টি ও মানবজাতি সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা কী? আমরা সেই উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়ে চলছি কি না, কাজ করছি কি না? নির্দেশনা মোতাবেক দুনিয়ার কাজে অংশ নিচ্ছি কি না?

ধর্মের ব্যাপ্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ঘিরে। সৃষ্টিই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা ব্যাপ্ত। ধর্মের আওতাও অধিকাংশই ইহলৌকিক কর্ম ও চিন্তা-চেতনা। সৃষ্টিকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার সুবিন্যস্ত কর্মপ্রচেষ্টা। সৃষ্টি ও প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখতে যত নিয়মকানুন তা ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মের মূল উপজীব্য। ধর্মীয় গ্রন্থ একটা মশা থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে সবই ধর্মের আওতা। আমরা ব্যক্তিস্বার্থে না-বুঝে ধর্মের আওতাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে ফেলেছি। ধর্মকে রাষ্ট্রের গণ্ডিতে নিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। রাষ্ট্র একটা বিধিবদ্ধ আইনসৃষ্ট সত্তা। এর আবার ধর্ম কী! রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্মই সমান। রাষ্ট্র রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল ধর্মের নাগরিকদের নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। বসবাসরত মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবে। আমরা মানুষকে ধর্ম (জীবনবিধান) মেনে চলতে না-বলে রাষ্ট্রকে ধর্মিক বানাচ্ছি। মানুষ ধর্মহারা কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। মানুষ গড়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সমাজে নীতিবান-সুশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ুক– এদিকেও কোনো চেষ্টা নেই। মসজিদ গড়ে নগদ সাওয়াব অর্জন করে বেহেশতে যাবার স্বপ্ন দেখছি। গ্রামে-গঞ্জে অনেক মসজিদেই ধর্ম পালনের লোকের খুব অভাব। আমরা দলাদলি করে এক মহল্লাতেই একাধিক মসজিদ তৈরি করছি। দল রক্ষার স্বার্থে মসজিদে যাচ্ছি। সেখানে কে কত দামী টাইলস বসাতে পারি তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছি। মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম (জীবনবিধান) পালন দরকার। বর্তমানে জীবনবিধান মেনে চলা লোকের বড্ড আকাল– এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা লোকেরও বেশি আকাল।

সৃষ্টিকে নিয়েই ধর্মেও মূল আলোচনা। সৃষ্টি না থাকলে ধর্ম থাকে না। সৃষ্টির পরিচালনা, পরিবেশ রক্ষা, সৃষ্টির কল্যাণ, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক অবস্থান, কর্মপদ্ধতি, কর্মের আওতা, কর্মের আদেশ-নিষেধ, সৃষ্টজগৎকে জানা ও পরিচালনার জন্য শিক্ষা, ভাবনা-চিন্তার পরিধিই ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু। ধর্মের এমন কোনো কথা নেই যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ধর্মের মূলও ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনা এবং পরকালের বিশ্বাসের মধ্যে প্রোথিত। ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনা ধর্মের প্রধান অবলম্বন। ধর্মের মূল কাজগুলোই ইহকালের, পরকালে কোনো কাজ নেই, শুধু প্রতিদান প্রাপ্তি– পুরস্কার অথবা তিরস্কার। ধর্মবিশ্বাস ও পরকালের পুরস্কারের ব্যবস্থা ও তিরস্কারের ভয় না থাকলে সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার অনুকূলে কাজ-কর্ম থাকতো না। মানুষ তার খেয়াল-খুশিমতো ব্যক্তিস্বার্থে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে মনোনিবেশ করতো। স্রষ্টাকে অস্বীকার করতো। এতে সৃষ্টি টিকে থাকা দুরুহ হতো। স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যহত হতো। স্রষ্টার সন্তুষ্টিতে স্রষ্টার উদ্দেশ্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা, স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির সেবা করার জন্য সাহায্য চাওয়া ও প্রার্থনা করা, নিজেকে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই ইবাদত। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতও খোদাকে স্মরণ করার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সমুদয় কল্যাণমুখী কাজ করা, কল্যাণমুখী চিন্তা করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে নিহিত।

ধরুন, আমি একজন ড্রাইভার, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। গাড়ির সামনে একটা কুকুর ধীরে ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। কুকুরটার জীবনের কথা ভেবে, ব্রেক করে, কুকুরটাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করলাম। এটা আমার ইবাদত। আমি চাষ কাজ করে নিজের ও সাধারণ মানুষের খাবারের সংস্থান করবো, আমার ইবাদত। টেকনিক্যাল শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হবো, একটা পেশাকে বেছে নেবো, বৈধ উপার্জন করবো, সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে নিজে খাবো, সাধ্যমতো দান-খয়রাত করবো– এটা আমার ইবাদত। সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত করবো; তারা একটা পেশাকে বেছে নিয়ে উপার্জন করবে, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াবে, আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে, সৃষ্টির কল্যাণে কর্ম করবে– তাদের ইবাদত। সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, সৃষ্টির কল্যাণে তাদের কাজ করা আমার সাদকায়ে জারিয়া। আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করবো, সে যন্ত্র ব্যবহারে মানুষের কোনো কাজ, জীবনযাপন সহজ হয়ে যাবে, আমার ইবাদত। আমি এলাকাবাসীকে সুশিক্ষার দিকে আহ্বান করবো, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবো, তাদের ভালো কাজে ডাকবো, সাধ্যমতো তাদের সেবা করবো– এটা আমার ইবাদত, সাদকায়ে জারিয়াও বটে। এভাবে দুনিয়ার যাবতীয় সুকর্ম ভাবা ও করা, কাজের মাধ্যমে সৃষ্টির কল্যাণ করা, এবং কুকর্ম থেকে বিরত থাকাই

ইবাদত। এই ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহতায়ালা পরকালে ইবাদতকারীকে দেবেন। আমরা তো নামাজ. রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতাকে প্রায়োগিক দিকের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত– বাস্তব জীবনে, সমাজে ও কাজে প্রায়োগিকতা কোথায়? এভাবে ধর্মের প্রায়োগিক দিক ও কাজ আমরা চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে সমাজের আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছিনে কেন? তাহলেই তো সমাজের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, ইবাদতও হয়, আবার অনেক কাজ সাদকায়ে জারিয়া হয়। আমরা বিষয়টাকে পজিটিভলি নিচ্ছিনে কেন? আমরা পৃথিবীতে ভালোভাবে শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য ধর্মীয় দর্শনকে কাজে লাগাচ্ছিনে কেন?

মানুষ সামাজিক জীব। বনে-বাদাড়ে, মরুভূমিতে, বরফের রাজ্যে যেখানেই বাস করুক না কেন, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। বেদে-বেদুইনরা যাযাবর হয়ে পথে পথে ঘোরে। তাদেরও একটা সমাজ আছে। এটা মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট প্রবৃত্তি। মুসলমান ধর্মানুসারীরা যে সমাজেই থাক, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত পালনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইবাদত করে। কিন্তু এই ইবাদতের প্রতিটা কাজে ও ধর্ম পালনে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া জীবন-জীবিকা পরিচালনার অনেক সামাজিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনার নির্দেশনা আছে, যেগুলো ইবাদত করতে বলার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের কাজগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, যা মানব সভ্যতাকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখার সহায়ক বা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এগুলো সৃষ্টি দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। ইবাদত একটা ব্যাপক বিষয়, যা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের যাবতীয় কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর নির্দেশিত ইহলৌকিক কর্মজগৎ ও পরোলৌকিক বিশ্বাসকে নিঃশর্তভাবে পালন করাই হচ্ছে মূলত ইবাদত। আমরা ইহলৌকিক কর্মজগৎকে উপেক্ষা করছি কেন? আমরা অধিকাংশই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিনে, ভেবেও দেখিনে, শুধু পরকালের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন করে চলেছি। ইবাদত যে প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারই সৃষ্ট সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করা ও নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা– এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। অথচ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা বেখবর, অন্যমনস্ক, উদাসীন। এতে উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

একজন কৃষক তার বাড়িতে একজন রাখাল নিযুক্ত করলো। ক্ষেতে-খামারে কৃষকের কাজে সহযোগিতা করা, গরু চরানো রাখালের কাজ। রাখাল তার কাজের মাধ্যমে কৃষকের কাছে ভালো হতে পারে, কৃষকের আস্থা অর্জন করতে পারে। কৃষক তার সাধ্যমতো রখালকে ভরপেট খাবারের ব্যবস্থা করছে। প্রতি মাসে

নির্ধারিত বেতন দিচ্ছে। রাখাল যদি তার কাজ না করে একটা তসবিহ কিনে ঘরে বসে দিনের পর দিন তসবিহ টিপে কৃষকের গুণগান করতে থাকে তবে রাখালের দায়িত্ব পালন শেষ হবে কি না? কৃষকের রাখাল রাখার উদ্দেশ্য সফল হবে কি না? কৃষক তাকে ভালো জানবে কি না? আবার ভিন্নটাও হতে পারে। রাখাল তার কাজ করলো। কৃষকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। কৃষকের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করে না। তাকে অমান্য করে। কৃষক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে কি না?

রাখাল যত কাজই করুক কৃষকের নির্দেশনা মোতাবেক করা উচিত। এটাই কৃষকের বাড়িতে রাখালের কাজ করার উদ্দেশ্য। কৃষক তার রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করছে বিধায় তার প্রতি রাখালের কৃতজ্ঞ থাকাও উচিত। কৃতজ্ঞতা কোনো কাজ না; আবার কাজও কৃতজ্ঞতা না। আবার কাজ ও কৃতজ্ঞতা একে অন্যের পরিপূরকও না।

নামাজ মূলত কোনো কাজ না– আনুগত্য করা, দাসত্ব প্রকাশ করা; সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা– তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করে তার গুণগান করা, প্রার্থনা করা, তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা, তার প্রতি নত হওয়া। নইলে তার অপার কৃপা ও অপরিসীম অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বলা হয়েছে, '(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে (সালাতের অনুষ্ঠানসমূহ নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে), জাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করেঃ বিপদ–আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে; তারাই সত্যবাদী; আর তারাই হলো আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি।' (আল বাকারাহ, ২:১৭৭)। এখানে নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আগে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস; তারপর অর্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর ভালোবাসায় বিভিন্ন কাজে দান ও ব্যয়, জাকাত দেয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা (নামাজ পড়া নয়), অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব কাজ যারা করে তাদেরকে সত্যবাদী ও আল্লাহসচেতন ব্যক্তি বলা হয়েছে। এভাবে নামাজ ছাড়াও বেশ কয়েকটা কাজের প্রতি সরাসরি নির্দেশনা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই একটি আয়াতের অনুসরণ জীবন চলার পাথেয় হতে পারে, মানুষের

জীবনযাপন ও কর্মকে বদলে দিতে পারে। আমরা কেন এত বড় অনেক অনেক মূল্যবান নির্দেশনার মধ্যেও শুধু সালাত প্রতিষ্ঠা করাকে নির্দেশনা হিসেবে বেছে নিচ্ছি? আবার বলা হয়েছে, 'অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল জীবন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করতে ও জাকাত দিতে এবং এটাই শাশ্বত দীন'। (আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮: ৫)। এখানে দাসত্ব (লিইয়াবুদুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; এর ব্যাখ্যা কী? এখানেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ম-কানুন মেনে জাগতিক সকল কাজ (ইবাদত, লিইয়াবুদুন), নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত দেওয়াকে চিরস্থায়ী ধর্ম বলা হয়েছে। আমরা বাস্তব জীবনে ধর্মের নৈতিক বা মানসিক দিক (স্পিরিট) ও কর্মকে প্রয়োগ না করে এসবের আংশিক কাজ এবং আনুষ্ঠানিকতা ও লৌকিকতার (যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতা) মধ্যে ইবাদতকে ঠেলে দিয়েছি।

আবার 'আমল' শব্দটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'আমল' শব্দের একটা অর্থ হলো 'কাজ'। সে-অর্থে আমরা 'আমলনামা' শব্দটা ব্যবহার করি। 'আমল' শব্দটা আরবি, 'নামা' শব্দটা ফার্সি, অর্থ 'বিবরণ'। অর্থাৎ 'আমলনামা' হচ্ছে ভালো ও মন্দ কাজের বিবরণ, অর্থাৎ সারা জীবনের ভালো-মন্দ কাজের বিবরণ, যেটা শেষ বিচারের সময় নিজের কাজ নিজে দেখার জন্য আল্লাহ্ আমার হাতে দেবেন। অথচ আরবি পরিভাষায় ব্যবহৃত 'আমল' (কাজ) শব্দ দিয়ে আমরা শুধু 'তসবিহ তেলাওয়াত'-এর সংকীর্ণ অর্থে আমলকে (আল্লাহর নাম বা দোয়া-দরুদ পাঠের সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য দানা বা গুটির মালা ভক্তিসহকারে পাঠ করা) বুঝতে শিখেছি। ফলে দুনিয়ার অনেক ভালো কাজকে (ইবাদত) বাদ দিয়ে ভক্তি সহকারে দানা গুনে আল্লাহর নাম জপার (আরেকটা ইবাদত) দিকে ঝুঁকে পড়েছি। অথচ আমরা চাষিরা মাঠে ধান গাছের দিকে তাকিয়ে, আল্লাহর অশেষ রহমতের নিদর্শন খুঁজে পেয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে, সেটা তসবিহ গুনে বলার তুলনায় কম মহিমাকীর্তন হতো কি? এগুলো আমাদের ধর্ম পালনে সার্বক্ষণিক সকল কাজে ধর্ম ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা।

কুরআন যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান– এটাকে মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে কুরআনে নির্দেশিত কাজ করিনে। আবার অনেক ভালো কাজকে (আমল) ইবাদত বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিনে। শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের ভাসা-ভাসা কাজ (আনুষ্ঠানিকতা) করে ইবাদতের নামে চালিয়ে দিই। নামাজ প্রতিষ্ঠা করিনে। নামাজ রোজার অনুষ্ঠান করা, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে চলার পথে ব্যবহার করিনে। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় বাস্তব জীবনযাপন ও কর্মে ইবাদতের প্রায়োগিক দিক উপেক্ষিত রয়ে যায়।

এ দেশের রাজত্বের সীমা-পরিসীমা, সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে একটা সংবিধান ও আইন আছে। সকল নাগরিকের সে-আইন মেনে চলতে হয়। স্রষ্টার রাজত্বে কোনো সীমারেখা নেই– বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তার বিধি-বিধান আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভালোভাবে চলুক, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সার্থকতা বিশ্ব-বিধাতা চান। সেজন্য তিনি বোধশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টির সেরা জীবের জন্য আইনকানুন, চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা জীবের কাজ হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নির্ধারিত আইনকানুন ও চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী চলা। নির্দেশিত পথ মোতাবেক কর্ম করা এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তাতে সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট। এর জন্য রয়েছে পরকালের প্রতিদান। সৃষ্টি টিকে থাকার জন্যও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সৃষ্টির ভারসাম্য আছে। আছে স্বয়ংক্রিয় সৃষ্টি ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একের প্রয়োজনে অন্যের সৃষ্টি। সৃষ্ট প্রকৃতি, প্রাণি ও জীব একে অন্যকে টিকিয়ে রাখে, একে বলে পারস্পরিক টিকে থাকা। নইলে সৃষ্টি বিপর্যয় হয়। বলা যায়ঃ

> জীব দিলো প্রাণ নিজ প্রয়োজনে
> উদ্ভিদ দিলো সুধা প্রতিদানে–
> মিটলো জীবের ক্ষুধা অনায়াসে
> সার্থক হলো সৃষ্টিকর্ম গূঢ়-তত্ত্ব রসে।

ধর্ম-দর্শন তা-ই বলে। আমরা কতিপয় না-বুঝ ধর্মভীরু লোকের অপরিণামদর্শী কথায় ধর্মের আওতার মূল উপজীব্য ও উদ্দেশ্যকে গুটিয়ে শুধু পরকালের প্রতিদান প্রাপ্তির মধ্যে ধর্মকে সীমাবদ্ধ করি কী করে? ইহকালের উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্ম-চিন্তা-চেতনা না থাকলে ধর্ম থাকে কী করে? পরকালই-বা থাকে কী করে? সৃষ্টি ও কর্ম আছে বলেই-না ধর্ম আছে। সৃষ্ট প্রকৃতি, জীবনাচার, ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্ট জগৎ নিয়ে শিক্ষা আছে। সৃষ্টি-কর্মকে ধর্ম থেকে পৃথক করা যায় না। যেমনি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা থেকে ধর্ম শিক্ষাকে আলাদা করা যায় না।

আবার ধর্মশিক্ষাকে পরকালের বেহেশত নসিবের সরু গলিতে নিবদ্ধ করেছি। কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। শুধু কুরআন ও হাদিস শিক্ষাকে দীনি শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) বলছি; আর দুনিয়ার বাকি সকল বিষয়ের শিক্ষাকে নন-দীনি শিক্ষা বলছি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে দীনি শিক্ষার নাম দিয়ে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের নিয়ম-নীতি (পরকালের জন্য আনুষ্ঠানিকতা) ও এ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। এ ধরনের বিভাজন নিতান্তই অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কুরআন ছাড়া ইসলাম ধর্ম অচল। আবার শিক্ষা ছাড়া সৃষ্টিকে বোঝা, নির্দেশনা

মোতাবেক জীবনযাপন করা, জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। কুরআনকে ঘিরেই ধর্মের সকল ব্যাখ্যা। কুরআন আবার এর পূর্বে অবতীর্ণ সকল ‘আসমানি কিতাব’কে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে। সন্দেহমুক্ত কিতাব বলে দাবি করে। আর বলে যে, ‘আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা।’ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এটি (কুরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা ও উপদেশ।’ (আল ইমরান, ৩:১৩৮)। পথনির্দেশিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে পথনির্দেশিকা বোঝা যায় না। সে মতো চলাও যায় না। সেজন্য কোরআনে উল্লিখিত একটা তুচ্ছ মশা থেকে অকল্পনীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিষয়কে ইহকাল ও পরকালের জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা নেওয়াটা ধর্মশিক্ষার আওতাধীন। এর সপক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে অসংখ্য আয়াত ও বর্ণনা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বলা হয়েছে, “অসীম করুণাময় (আল্লাহ)। তিনিই কুরআন শিখান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (আর) তিনি তাকে শিখান ‘বয়ান’ (জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা)।” (আর রহমান, ৫৫:১-৪)। এই সুরার পুরোটা জুড়েই বর্ণনা করা হয়েছে জীবজগৎ ও বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে এবং বার বার বলা হয়েছে, ‘অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?’ এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন কুরআন ও ‘বয়ান’ (জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা) শেখানোর জন্য। এখানে মানুষ সৃষ্টির আরেকটা উদ্দেশ্যকে (কুরআন শিক্ষা দেওয়া) বলা হয়েছে। ‘কুরআন শেখানো’ বলতে কুরআনে বর্ণিত শব্দগুলির উচ্চারণ করে পড়াকে বোঝানো হয়নি; কুরআনের আওতা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎ, সকল কর্ম এবং প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স) বিষয়ের জ্ঞানকে আহরণ করা, উপস্থাপন করা ও ব্যাখ্যা করাকে বোঝোনো হয়েছে। এখানে ধর্ম শিক্ষার মধ্যে সামুদয়িক শিক্ষা চলে আসে। এ থেকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতা সম্বন্ধে পুরো ধারণা পেতে পারি এবং বুঝতে পারি, শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতাকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কোনো যুক্তি নেই। আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জীবিকা অর্জনে কুরআন-হাদিসসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান ভালো পথে কাজে লাগাতে হবে– এটাও ইবাদত।

এবার ‘ধর্ম’ শব্দটা নিয়ে দু-একটা কথা না বললেই নয়। ধর্ম শব্দটা নানাজন নানা অর্থে ব্যবহার করে। বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিকেরা এটাকে অপার্থিব এক শক্তির আনুগত্য করাকে বোঝে। মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে– সাধারণ কর্মজীবন ও ধর্মীয় জীবন

আলাদা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা (সেকিউলারিস্টরা) রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। আমরাও ধর্ম বলতে জীবন-বিচ্ছিন্ন আলাদা কিছু ভাবতে শিখেছি। জীবনকর্ম ও দৈনন্দিন চিন্তা-চেতনা থেকে জীবনবিধানকে (ধর্মকে) বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। কেউ কেউ আলাদাভাবে ধর্মবিধান পড়ছি; পরকালে কল্যাণের আশায় ধর্মীয় পোশাক পরে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করছি। সব ধর্মের ধার্মিকদের একই অবস্থা। পুরো বিষয়টা আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছি। বাস্তব জীবনের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম থেকে ধর্মকে ক্রমশই বিদায় জানাচ্ছি। ধর্মের বিষয়টা আসলে আদৌ তা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যা করেছেন, না-বুঝে, না-জেনে করেছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থাও মানুষ, জীবনকর্ম ও মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে আলাদা কিছু নয়। বাংলা ভাষায় ধর্ম মানে ধৃ+মন, অর্থাৎ মন যে বিশ্বাসকে মনে ধারণ করে রাখে। কিন্তু ধর্ম মানে শুধু বিশ্বাস নয়। মানুষ তার অন্তর্নিহিত ধারণা (আন্ডারলাইং এজামশন) থেকে সকল কাজ ও নতুন নতুন চিন্তা করে। মনের বিশ্বাসও অন্তর্নিহিত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। চিন্তা-চেতনা ও অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তখন মানুষ ও অনুভূতিহীন রোবট এক হয়ে যায়। বাংলায় ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দটা কুরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দের সমার্থক হিসেবে আমরা গণ্য করি। আসলে দীন শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দ বাংলায় নেই। মুসলমানদের দীনের একটি অংশ হলো ইবাদত এবং নৈতিকতা। কিন্তু দীন বলতে আরও বিস্তৃত বিষয়কে বোঝায়। মানব জীবনের যত দিক, বিভাগ ও বিধানসম্মত বিশ্বাস আছে সবকিছুই দীনের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমি দীনকে 'জীবনবিধান' (মানব জীবনের যত দিক, বিভাগ ও বিধানসম্মত বিশ্বাস) অর্থে মোটামুটিভাবে ব্যবহার করতে চাই। অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে জীবন যে বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, ব্যবস্থা, কর্তব্যনির্দেশ পালন করবে তাই-ই জীবনবিধান বা দীন। এগুলো পালন করতে গেলে 'বিধানকর্তা'র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হয়। বিশ্বাস ও কর্ম ছাড়া ধর্ম হয় না। দীন মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেকিউলারিস্টরা রাষ্ট্রের কিছু কর্মভিত্তিক আইন প্রণয়ন করে মানুষের কতিপয় কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা বোঝে না যে, মনের পরিবর্তন ছাড়া কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সৃষ্টির বিধান কিন্তু মন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এটাও সত্য যে, সৃষ্টির বিধানকে না মানলে সৃষ্টি টিকে থাকে না। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'ধর্ম' বা 'দীন' থেকে আলাদা করার যে সেকিউলারিজম, এর ভিত্তি খুবই দুর্বল। রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে 'জীবনবিধান'কে আলাদা করা যায় না। আলাদা করলে রাষ্ট্র চলে না। প্রকৃতির ধর্মও তা নয়। জীবনবিধান প্রকৃতির ধর্মের অনুকূলে কাজ করে। কোনো ধর্মই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোনো কাজের অনুমতি দেয় না। প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখা, সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা, প্রকৃতির অনুকূলে কাজ করা প্রত্যেক

ধার্মিকের দায়িত্ব। অথচ আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাধারণ জীবন থেকে জীবনবিধানকে যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে জীবনযাপন করার মতবাদ চালু করতে চাই। এতে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা, কর্ম, চিন্তা-ভাবনা ব্যাহত হয়। তাই দিনে দিনে ভোগবাদের সাহচর্যে, সেকিউলারিজমের প্রাবল্যে সাধারণ আটপৌরে জীবন থেকে জীবনবিধান (ধর্ম) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখন মানবিক বৈশিষ্ট্যবিহীন এক অভিশপ্ত ভোগবাদের নিছক ভাবলেশহীন যন্ত্র বনে গেছে। এতেই বর্তমান সমাজ, জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যত বিপত্তি, অব্যবস্থা, দুর্গতি।

ইহবাদীরা (সেকিউলারিস্ট) ইহকালের কাজকর্মে ধর্মের ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে পুরো ধর্মব্যবস্থাকে বিতাড়িত করে পরকালে পাঠিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ ধার্মিকেরাও ইহবাদীদের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় না জড়িয়ে স্বেচ্ছায় অজ্ঞতাবশত জীবন ও জীবিকাকে উপেক্ষা করে ধর্মকে পরকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছে। ইহকালের পুরো সৃষ্টিজগৎ ও কর্মজগৎ ইহবাদীদের জন্য ছেড়ে পরকালের চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এবং নিজেকে জিন্দা লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অথচ ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনাই ধর্মের মূল ভিত্তি। ইহকাল আছে বলেই যে পরকাল আছে, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। ধার্মিকদের ইহজাগতিক কর্মজগৎকে না বুঝে, বিনা তর্কে ছেড়ে দেওয়াটা আদৌ উচিত হয়নি। আমি তো দেখি, ইহবাদী ও নাস্তিক্যবাদীদের সাথে ধর্মবাদীদের কোনো বিভেদ নেই− মাত্র দুটো ক্ষেত্র বাদে। ইহবাদীরাও দুনিয়ার কর্মে বিশ্বাসী, ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ধার্মিকেরাও তাই। ইহবাদীরা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখতে চান, ধার্মিকেরাও তা চান। কিছু কিছু প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ আছে, যার স্বীকৃতি ইহবাদীরা দেন, ধর্মে বিশ্বাসীরা দেন না। কারণ বিশ্বব্যবস্থাকে সাবলীলভাবে পরিচালনার ও টিকিয়ে রাখার স্বার্থে স্রষ্টা সেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন। ইহবাদীরা পরকাল বিশ্বাস করেন না, ধার্মিকেরা পরকালের কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখেন।

কুরআনের ওপরে-বলা আয়াত ছাড়াও সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, ‘তোমরাই (মুসলিমগণ) শ্রেষ্ঠ উম্মত (সম্প্রদায়/জাতি), মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা ন্যায় কাজ (সত্য বলা, পরোপকার করা, ন্যায়বিচার করা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন− অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি)-এর আদেশ করবে আর অন্যায় কাজ (মিথ্যা বলা, মানুষকে কষ্ট দেওয়া, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি) নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে; আর আহলে কিতাবিগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে কিছু আছে মুমিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।’ (আল ইমরান,

৩:১১০)। প্রশ্ন করা যায়, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এ উম্মতের বিশ্বব্যাপী এহেন নিঃশেষিতপ্রায় শোচনীয় দুর্দশা কেন? এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করলে শ্রেষ্ঠ উম্মতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে মানবজাতির কল্যাণ করা তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। শ্রেষ্ঠ উম্মত নিজেদের কল্যাণই তো বোঝে না, তা মানবজাতির কল্যাণ করবে কী করে? আবার চিন্তা ও কাজ ছাড়া মানবজাতির কল্যাণ আসে কী করে? এখানে কল্যাণ অর্থ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কাজের ও চিন্তার সমষ্টি। অন্য আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।' (আলে ইমরান, ৩:১০৪)। এখানেও কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ও সৎকাজের আদেশ করতে বলা হয়েছে। এসব করার জন্য একটা দল (এ গ্রুপ অব পিপল) থাকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব (আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে তথা আমার জানিয়ে দেওয়া মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের কাজকে উদ্দেশ্যের স্থানে এবং পাথেয় বিভাগের কাজকে পাথেয়র স্থানে রেখে জীবন পরিচালনা) করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' এখানে এক শ্রেণির বোধশক্তিহীন মানুষ এই 'দাসত্ব, ইবাদত (লিইয়াবুদুন)' শব্দের কুরআন ও হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা দেওয়াতে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলমান জাতি আজ অধঃপতন ও অন্ধকারের পথে পরিচালিত হচ্ছে। এদের একটা বিরাট অংশ দুনিয়া ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার মূল কাজ, পেশা, কাজের বাস্তব প্রায়োগিকতা ও দায়িত্বকে এড়িয়ে দুনিয়ার চিন্তা ও কর্মকে উপেক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয় কর্ম বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ইহজগতের সামগ্রিক শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত না করে শিক্ষাকে খণ্ডিত করেছে।

আদর্শিকভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। মুসলমানেরা তাদের ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত করে না। তারা তাদের পরবর্তী সাত পুরুষ বসে খাওয়ার জন্য নির্বোধ ও মোহমুগ্ধের মতো সম্পদ জড়ো করে না। তারা বৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করে। তা দিয়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয়তা মেটায়, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দেয়। অতিরিক্ত সম্পদ খোদার সন্তুষ্টির জন্য মানবকল্যাণে ব্যয় করে; আত্মীয়-স্বজন, গরিব-মিসকিনকে অকাতরে দান করে, জাকাত দেয়। সন্তান-সন্ততিকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সম্পদ করে গড়ে তোলে। তারাও সম্পদ উপার্জন করবে; তারাও নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদ মানবকল্যাণে দান ও ব্যয় করবে। (উল্লিখিত সব কাজই ইবাদত)। এভাবে সুখ-শান্তিতে দুনিয়া চলবে, সৃষ্টি টিকে থাকবে। সমাজে অভাব থাকবে না। এ দেশে মুসলমানদের যদি এ রকম আল্লাহ নির্দেশিত মন-মানসিকতা হতো

তাহলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক কমে যেত। সামাজিক বসবাসে শান্তি ফিরে আসতো। দেশে অসহায়, হতদরিদ্র, গরিব-মিসকিন থাকতো না। আমরা ইবাদত ও অন্তরের আওতাকে অতি সংকীর্ণ করে ফেলেছি। বলা হয়েছে, ‘তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ-সচেতন হও এবং শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (এ ব্যয়) তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর; আর যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।’ এখানে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যেও কল্যাণ (পরকালের মুক্তি) নিহিত আছে– এ কথা বলা হচ্ছে। নিজের অর্জিত সম্পদ অন্যের জন্য ত্যাগ বা কুরবানিও ধর্ম পালনের (ইবাদতের) অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিষয়টা মানুষকে বার বার বলার মাধ্যমে মনের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন। তাহলে সময়ের ব্যবধানে পুরো বিষয়টা এ দেশের মানুষের একটা সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়াবে। এমনইভাবে নামাজ-রোজা ছাড়াও শিক্ষা, পেশা ও কর্ম; আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী, দুঃস্থ ও অসহায়কে ধন-সম্পদ দান; সাদকায়ে জারিয়া; অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলোও যে সরাসরি কুরআন নির্দেশিত ইবাদত বা দাসত্ব তা সাধারণ মানুষের মননশীলতায় ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করানো দরকার। আমাদের মৌলভি-মাওলানারা সকলে মিলে এভাবে মানুষকে বোঝাতে থাকলে দিনে দিনে মানুষের অবচেতন মনে বিষয়টা গেঁথে যায়। মানুষ শিক্ষা পায়, সম্পদের বণ্টন সুষম হয়, সমাজ উপকৃত হয়।

এভাবে দান-খয়রাত ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য অনেকবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো; আর যদি গোপনে অভাবীদের দান করো তা তোমাদের জন্য অধিক ভালো...।’ (আল-বাকারাহ, ২:২৭১)। অথচ আমরা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হচ্ছিনে, অর্থ-সম্পদকে পুঞ্জীভূত করছি। সম্পদকে নিজের বলে দাবি করছি। অর্থ-সম্পদকে গরিব-অভাবীদের জন্য এবং আল্লাহর পথে দান করতে কুণ্ঠা বোধ করছি কিংবা কার্পণ্য করছি। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছি। বলা হয়েছে, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।’ (আত তাকাসুর, ১০২:১)। আরো বলা হয়েছে, ‘দুর্ভোগ প্রত্যেক সামনে ও পেছনে নিন্দাকারীর জন্য। যে সম্পদ জমা করে এবং তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। তুমি কি জান হুতামা কী? এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।’ (আল হুমাযাহ, ১০৪:১-৭)। এতে বোঝা যায়, সম্পদ দান-খয়রাতের মধ্যে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত আছে। ধন-সম্পদ জমা করার জন্য নয়। বৈধ পথে উপার্জন করতে হবে। প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে হবে। বাড়তি

সম্পদ গরিব-দুঃখী, অভাবীদের মধ্যে দান করে দিতে হবে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। এটাও একটা ইবাদত। এর জন্যও পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আমরা কুরআনকে সম্মান করি, চুমো খাই, আংশিক সুবিধাজনক কথাগুলোকে মানি; অনেকটাই বুঝেও না বোঝার ভান করি, কৌশলে এড়িয়ে যাই। আমরা বেশি বেশি নামাজ-রোজার আনুষ্ঠানিকতা করি, তসবিহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করি, সম্পদ মজুদ করি, নামাজ-রোজার প্রায়োগিক দিকগুলো উপেক্ষিত রয়ে যায়। অথচ আমরা যদি অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সাধ্যমতো দান-সাহায্য করতাম, সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করতাম, পেশাগত শিক্ষা শিখতাম, পেশাগত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতাম, কাউকে প্রতারিত না করতাম, আর্থিক লেনদেন সততার সাথে করতাম, সবার প্রতি সমান আচরণ ও নিরপেক্ষ বিচার করতাম, সৎ পথে রোজগার করতাম, তাহলে নামাজ-রোজার বাধ্যতামূলক ইবাদতের তুলনায় তা কোনো অংশে কম হতো না। পরকালেও এসবের জন্য নাজাত (মুক্তি, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি) পেতাম।

কুরআন অসংখ্য জায়গায় বিভিন্ন আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্ঞানী (আলেম) ও শিক্ষা নিয়ে সরাসরি নির্দেশনা দিয়েছে। আবার মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য উদ্ভব ঘটানো হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। অথচ সারা বিশ্বে মুসলমানরা অসচেতন, দুর্দশাগ্রস্ত, শিক্ষা-বঞ্চিত, নিগৃহীত, অনুন্নত, অধিকার-বঞ্চিত, শতধাবিভক্ত। এর কারণ কী? সমস্যাটা কোথায়? এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ কম। তবু কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। উপরোক্ত (আলে ইমরান, ৩:১১০) আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মত কারা তা বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে এবং মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে তা বলা হয়েছে। কল্যাণ কোথায়, অর্থাৎ ন্যায়কাজ (সত্য বলা, পরোপকার করা, ন্যায় বিচার করা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি)-এর আদেশ করা, আর অন্যায় কাজ (মিথ্যা বলা, মানুষকে কষ্ট দেওয়া, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি) নিষেধ করা– সবই বোধগম্য ভাষায় বলা হয়েছে। 'আর আহলে কিতাবিগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক'– এসবই বলা হয়েছে। মানবজাতির মধ্যে অনেক আহলে কিতাবিগণের ঈমান নেই, আবার অনেকেই ফাসিক তাও বলা হয়েছে। মুসলমান জাতি ন্যায় কাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও মুসলমানি বৈশিষ্ট্যে অন্য জাতির তুলনায় পিছিয়ে আছে। তাহলে মুসলমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এ কথা বলা কি অন্যায় হবে? মানবজাতির কল্যাণ করার জন্যই যাদের উদ্ভব ঘটানো

হয়েছে, সেই মুসলমান জাতি কি মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত? আমরা কি মানবজাতির কল্যাণ করছি? জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানবকল্যাণে ব্যবহৃত উন্নত পেশা ছাড়া মানবকল্যাণ কীভাবে সম্ভব? অর্থনৈতিক শক্তি নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাধনা নেই, মনে ও কাজে ইসলামি বৈশিষ্ট্য নেই, মন-মানসিকতার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত– কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে?

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে আবারও কিছু কথা বলি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্ঞানী (আলেম) ও শিক্ষা নিয়ে কুরআনের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। আমরা জানি, একটা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নতি সব কিছুই নির্ভর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ওপর। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত, সমৃদ্ধ ও মানবিক গুণে পূর্ণ। শিক্ষাহীন ব্যক্তি অন্ধ। আবার অজ্ঞতা অন্ধকারের সমতুল্য। জ্ঞানের কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হতে পেরেছে। এখানে কয়েকটা আয়াতের উল্লেখ করি। ‘পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘আলাক’ (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। (ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ুর দেয়ালে ঝুলে থাকে)। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।’ (আল আ‘লাক, ৯৬:১-৫)। ‘...তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না; আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না; তারা পশুর মতো বরং তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট; ওরা উদাসীন (ওরা কমন সেন্স-ও ব্যবহার করে না)’ (আল আ’রাফ, ৭:১৭৯)। ‘নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত ও দিনের আবর্তন, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান নৌযান, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা জীবিত করা মৃতভূমিতে যা উৎপাদন করেন তা, উহার সাহায্যে পৃথিবীতে বিস্তৃত হওয়া সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে কমন সেন্স (আল্লাহপ্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান/বোধশক্তি)-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন (কুরআন বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য বহু উদাহরণ) রয়েছে।’ (আল বাকারাহ, ২: ১৬৪)। ‘... বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?...।’ (আজ জুমার, ৩৯:৯)। ‘তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বিচক্ষণতা দান করেন; আর যাকে বিচক্ষণতা দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় (তার তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষ বিচক্ষণতা অর্জন করে; আর যে বিচক্ষণতা অর্জন করে সে প্রভূত কল্যাণকর একটি জিনিস লাভ করে); আর বুদ্ধিমানগণ ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।’ (আল বাকারাহ, ২:২৬৯)। ‘যেমন (তোমাদের কল্যাণলাভের একটি

বিশেষ দিক হলো) আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।' (আল বাকারাহ, ২:১৫১)।

আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্ঞানী (আলেম) ও শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেলাম। শিক্ষার গুরুত্ব বুঝলাম। ইসলামের 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান'কে বোঝার জন্য, সে মোতাবেক চলার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞান দরকার। আমরা সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছি কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতি করে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারছিনে কেন? এখানে জ্ঞানী বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? আমরা কি কুরআন নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে জ্ঞানার্জন করছি? কোরআনে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ দেখার মতো প্রয়োজনীয় কমন-সেন্‌স ও বিচক্ষণতা কি আমাদের আছে? মানুষ জ্ঞানহীন অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে। আমরা কি জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে ডাকছি? জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ আনছি? আমরা কি সন্তান-সন্ততিকে জ্ঞানান্বেষণে পাঠাচ্ছি? আমাদের কাজ-কর্মে ও বৈশিষ্ট্যে কি খোদা নির্দেশিত মুসলমান বলে মনে হয়? তাহলে আমাদের এই অবস্থার জন্য অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, বিপথে চলা, অপরিণামদর্শী কার্যকলাপই দায়ী। আমরা মুসলমানেরা যদি আল্লাহর নির্দেশিত সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতাম; সৃষ্টি ও মানুষের কল্যাণকামী হতাম; জ্ঞান-বিজ্ঞানে, চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ বাড়াতাম; ন্যায় ও উদারতার আদর্শ দিয়ে সমস্ত মানবকূলকে কল্যাণের কাজে আহ্বান করতাম; অন্য জাতির হতাশ, দিগ্‌ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানবকূলও আমাদের সুমহান উদারচেতা কল্যাণময় সুশীতল ছায়াতলে শান্তির জন্য এসে ঠাঁই নিত, আমাদের নামেমাত্র মুসলমানরাও কল্যাণের পথে আসতো, পথভ্রষ্ট জীবনের দিকনির্দেশনা পেত। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবর্জিত কতিপয় মৌলভি-হুজুর সমাজে 'পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার' অপব্যাখ্যা দিয়ে খণ্ডিত শিক্ষার তালিম দিতে পারতো না। এ লোকগুলো ধর্মের নামে না-বুঝ, শিক্ষাহারা ও অবুঝ মুসলমানদেরকে 'জিন্দা লাশ' বানাতে পারতো না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হতো। পৃথিবীটা বাসযোগ্য হতো, আমরাও পরকালে মুক্তি পেতাম।

মানবজাতির একটা অংশ খোদাদ্রোহী হবে, শয়তানি করবে, ভিন্ন মতাবলম্বী হবে– এ সবই তো ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। তাদের মতবাদের কারণে বা নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে বা ধর্ম ও শিক্ষার পক্ষপাতদুষ্ট, অপরিণামদর্শী ও একদেশদর্শী ব্যাখ্যার কারণে দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ, পেশা, কর্মজীবন, চিন্তা ও চেতনাকে বাদ দিয়ে বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কেবল পরকালের বেহেশত বা স্বর্গ নসিবের প্রত্যাশায় ঘরে বসে তসবিহ বা মালা জপলে তা কুলনাশক ও আত্মবিনাশক

হবে। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা, মন-মানসিকতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব আনতে হবে। স্রষ্টার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ইহকালীন কর্মই মূল ধর্ম– এটা মানতে হবে। নইলে নাস্তিক্যবাদী ও ইহবাদীরা ক্রমশই পুরো ধর্মকে ধর্মভীরু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গ্রাস করবে। নির্দেশনা এসেছে এভাবে, 'অতঃপর যখন সালাত শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে (কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর (এ সময়ে) আল্লাহর জিক'র (কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য) বেশি বেশি স্মরণ করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও (অতঃপর যখন সালাত শেষ হয় তখন জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ো এবং কাজ করার সময় কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য বেশি বেশি স্মরণ করে নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে থেকো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও)।' (আল জুমু'আহ, ৬২:১০)। সেজন্য ধর্মকে পেশা না বানিয়ে বিভিন্নমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় পেশায় বৈধ উপার্জন করা প্রতিটা মুসলমানের জন্য জরুরি কাজ। 'হালাল রুজি উপার্জন করা অপরাপর ফরজের পর একটি ফরজ কাজ।' আমাদেরকে বৈচিত্র্যময় পেশায় যাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

আমাদের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি আনতে হবে; প্রযুক্তি-কারিগরি-ব্যবসা-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা চালু করতে হবে। জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে যেতে হবে। শিক্ষায় নৈতিকতা, মূল্যবোধ ফেরাতে হবে। শিক্ষার মান বজায় রাখতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। বিভিন্নমুখী কাজ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইবাদত করতে হবে।

এ বিষয়ে একজন প্রখ্যাত কুরআন গবেষক তাঁর লিখিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়– প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' বইয়ে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশ্লেষণ ও হাদিসসমূহ উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো ৪টি গ্রুপে বিভক্ত। যথা: ১. উপাসনামূলক কাজ: কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, জাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হজ করা ইত্যাদি। ২. ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ: সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাথে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড়বিহীন না থাকে– এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি। ৩. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ: খাওয়া, পান করা, ব্যয়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি। এবং ৪. পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ: সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি। (পৃষ্ঠা-৩০)।

তিনি সিদ্ধান্তে বলেন, "বেশিরভাগ মুসলিম মনে করেন বা মেনে নিয়েছেন– 'ইবাদত' শব্দটি দ্বারা বোঝায় সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ, কুরবানি, তসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ। তারা আরো মনে করেন 'ইবাদত করার' অর্থ হচ্ছে ঐ কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি শুধু করা। তাই, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম এ আয়াতের ভিত্তিতে সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ, কুরবানি ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি পালন করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছেন। আর তাই দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহ 'ন্যায় এবং অন্যায় বিভাগে' যে কাজগুলোকে উল্লেখ করেছেন সেগুলো পালন করা এবং উপাসনামূলক কাজগুলো থেকে আল্লাহ যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সে শিক্ষাগুলো জানা ও তার ওপর আমল করার দিকে তাদের খেয়াল খুবই কম।" (পৃষ্ঠা-৪৮)। তিনি যুমার/৩৯:২৭,২৮; নিসা/৪:৩৮; আনকাবুত/ ২৯:৪৫; বাকারাহ/২:১৮২; হজ/২২:৩৭ সহ অন্যান্য আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করে বলেন, "চিন্তা করে দেখুন, একটিমাত্র শব্দের (লিইয়াবুদুন) অসতর্ক ব্যাখ্যা ও বুঝ কীভাবে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিকে চরম অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করেছে বা কীভাবে তাদের জান্নাত থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই অসতর্ক ব্যাখ্যাটির জন্যে অধিকাংশ মুসলিম আজ মনে করছে বা মেনে নিয়েছে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ, কুরবানি, তসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে। তাই তো দেখা যায়– ১. উপাসনামূলক কাজগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন এমন মুসলিমদের অধিকাংশেরই ন্যায় অন্যায় বিভাগের কাজগুলো বাস্তবায়নের প্রতি তেমন বা মোটেই খেয়াল নেই; ২. মুসলিম সমাজ ও দেশগুলোতে ন্যায় কাজের দারুণ অভাব কিন্তু অন্যায় কাজে ভরপুর।" (পৃষ্ঠা-৫০)।

তিনি 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়' শিরোনামে বলেন, "নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো তথা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য; ২. জীবনের অন্য তিন বিভাগের বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়; ৩. উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।"

এমনই অনেক ইসলামি চিন্তাবিদের বিশ্লেষণ আমি ইন্টারনেট ঘেটে পড়ে দেখেছি, যেখানে কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করে পার্থিব জীবন, সমাজগঠন, পেশা ও জীবনকর্মকে ইবাদতের বা দাসত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখানো হয়েছে। এখানে একজন চিন্তাবিদের লেখা উল্লেখ করছি:

“With this wider concept of Ibadah, it is painful to note that we have confined the term Ibadah to obligatory prayers and have narrowed down the concept of religiosity to the performance of Salah and Saum (fasting). We often forget that adherence to the Divine Commands in our behaviour with fellow-beings, following His directives in agricultural, commercial and professional works and showing honesty and truthfulness in financial transactions is also Ibadah and no less obligatory than the daily prayers. In fact, the Qur’anic concept of Ibadah demands change in this attitude and invites the people to build up their mind that as performance of five-times namaz is obligatory for a mumin, in the same way keeping one’s words, adopting lawful means of livelihood, showing honesty in financial matters, doing justice to all and taking care of rights of have-nots, workers, servants and other weaker sections are also essentially required from them.” (Quranic Concept of ‘Ibadah (worship)’- Jan 2011, Prof. Zafarul Islam teaches in the Deptt. of Islamic Studies, AMU).

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ধর্ম বলতে এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপন, পেশা, কর্মপ্রক্রিয়া, আচার-আচরণ, চিন্তাশীলতা, স্বভাব, আর্থিক লেনদেন ও স্রষ্টার স্মরণ প্রভৃতি স্রষ্টার কতকগুলো বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস এনে সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ মোতাবেক পরিচালনা করাকে বোঝায়, যার মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। সৃষ্ট প্রকৃতি ও সৃষ্টিব্যবস্থা স্রষ্টার শাশ্বত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সৃষ্ট প্রকৃতি, সৃষ্টিব্যবস্থা ও বিধান সুচারুরূপে চলতে গেলে সকল বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে প্রজ্ঞা (জ্ঞান-বিজ্ঞান/হিকমাত) অর্জন করতে হবে। এখানে দ্বীনি শিক্ষা ও নন-দ্বীনি শিক্ষার কোনো প্রভেদ অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। মানুষের দায়িত্ব জ্ঞানার্জন ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজে টিকে থাকা, অন্যকে টিকে থাকতে সহায়তা করা এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখা। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য তার নির্দেশিত সকল কর্ম ও চিন্তা-চেতনা এবং প্রচেষ্টাই ইবাদত। এর জন্য রয়েছে পরকালে মহাপুরস্কার।

আরো বলা যায়ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাই পৃথিবীতে টিকে থাকা, আদর্শ সমাজগঠন ও উন্নতির মূলভিত্তি। শিক্ষা ন্যায় থেকে অন্যায়কে, ভালো থেকে মন্দকে পার্থক্য করতে শেখায়। শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত জাতিসত্তার উদ্ভব হয়। শিক্ষা কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান থাকলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করে। সমাজের

মানুষকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে, নৈতিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে না পারলে বন্যার স্রোতের মতো অর্থনৈতিক সম্পদ ভেসে গেলেও তা দিয়ে মানুষের কোনো কল্যাণ বয়ে আনা যায় না। বরং তাতে সামাজিক পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে, স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি-রক্তারক্তি বাড়ে। শিক্ষার অভাবে মানুষ তার মূল বৈশিষ্ট্য হারায়। মানুষ আর পশুতে কোনো পার্থক্য থাকে না। এ দেশে তাই-ই হচ্ছে। মানুষকে এই ভূপৃষ্ঠে টিকে থাকার জন্য এবং সৃষ্টিকে শান্তিপূর্ণ বসবাসের উপযোগী করার জন্য সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সামাজিক শিক্ষা বিস্তারে, সমাজসেবায় ও মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রণী ও ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

এমনিভাবে সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেমন ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ, যা একটা দেশের মানুষের জীবনযাপন, প্রচলিত বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা, জীবনাচার ও জীবনের বিশ্বাসকে বদলে দিতে পারে, আবার আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক। রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সি আছে যেমন– আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ। প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একাধিক অধিদপ্তর আছে। রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ-অধিদপ্তরের মাধ্যমে সুশিক্ষার আদর্শ ও প্রচার সমাজের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিস্তার ঘটাতে পারে। আবার সুশিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে নিয়ম-বিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ বা অকার্যকর করে দিয়ে শুধু মৌখিক বাচন-বচন খেয়ানত করলেও ফলদায়ক কিছু হয় না। দরকার সদিচ্ছা। তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে উপযুক্তভাবে প্রচার ও সক্রিয় করে দিতে পারলেই কালক্রমে তা দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবন-সংস্কৃতির অংশ হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োজন বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ও কাজে পরিণত করা।

আলোচনার এ পর্যায়ে বলা যায় যে, এ দেশে একটা সুব্যবস্থিত সৃষ্টির উদ্দেশ্য-অনুগামী শিক্ষিত অরাজনৈতিক সমাজ-সংগঠন (একদল লোক) তৈরি হতে পারে, যার মাধ্যমে এমনভাবে জীবনগঠন, সমাজসেবা, সামাজিক-শিক্ষা, ন্যায়চিন্তা ও প্রচেষ্টা পরিচালনা করা যায়, যা জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে (ইসলামি পরিভাষায় যার নাম ইবাদত); আবার পরকালের কল্যাণ, স্রষ্টা-সন্তুষ্টি ও মুক্তি নিশ্চিত করে। সেই সমাজতত্ত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য-সহগামী ও টেকসই হবে। সমাজে বসবাসরত প্রতিটা মানুষ সেই শিক্ষিত সমাজব্যবস্থাকে মেনে নেবে, জনগোষ্ঠী একাত্ম হয়ে দায়িত্ব পালন করবে, জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে রূপ নেবে এবং সাধ্যমতো সুশিক্ষিত সমাজগঠনে অবদান রাখবে। জীবনের সার্থকতা আসবে, জীবন পূর্ণতা পাবে, স্রষ্টার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

৪.

মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা

ছাত্রজীবনে সামষ্টিক অর্থনীতি ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি পড়েছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি পড়েছি। অর্থনীতির তেমন কোনো কিছুই শিখতে পারিনি। পরে উন্নয়ন অর্থনীতির বই কিনে অনেক কিছু জানতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু জেনেছি এ নিয়েও প্রশ্ন।

প্রতিদিনের পত্রিকা পড়া মানেই চারপাশের শতেক অবনতিশীল অবস্থার খবর মাথায় আসা। আমার মনে নাড়া দেয়। আবার সময় অতিক্রমণে ভুলেও যাই। অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আজ সকালে উঠে দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিতেই প্রথম পৃষ্ঠায় একটা হেডলাইনে লেখা দেখলাম ‘লোপাট ১৫০০০ কোটি টাকা’। খবরটা পড়লাম। এ দেশে এমনই খবর চন্দ্র-সূর্যের প্রতিটি তিথি-লগ্নে হরহামেশাই চোখে পড়ে। ‘হাজার হাজার কোটি’ শব্দটাও যেন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো লোপাটের খবর অনেক দিন পর লোকপরম্পরায় শুনি, পত্রিকায় আসে না। আজকের খবরটা না ভুলে প্রাসঙ্গিকতার কারণে সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি।

‘সরকারি ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, জ্বালানি তেল ক্রয়, খাদ্য বিতরণ, ব্যাংক, বিমা ও রাজস্ব খাত ঘিরে এ অনিয়ম হয়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য বিদেশি প্রকল্পে সরঞ্জাম কেনাকাটায় অনিয়ম ধরা পড়ে। করোনাকালেও থেমে ছিল না শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গরিব মানুষের খাদ্য বিতরণের টাকা ব্যয়ে অনিয়ম। যা নিরীক্ষা বিভাগের ২০২০-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।... বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক দুর্নীতি একটা সামাজিক ক্যানসারে রূপ নিয়েছে। ক্যানসার যেমন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে তারপর শান্ত হয়। তেমনি দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট– এসব সামাজিক ক্ষত দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু না করে শান্ত হবে না। দুর্নীতির কারণে সমাজে হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এতে সমাজের টার্গেট গ্রুপ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। জিডিপির একটি অংশ নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমির জন্ম হয়। সেখান থেকে দেশের বাইরে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে।’ (দৈনিক যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

ছাত্রাবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির যা শিখতে পারিনি, তার কিছু কিছু এখন শিখছি। পত্রিকার মাধ্যমে লুটপাটের একটা সামান্য অংশ গোচরিভূত হয়। বাকিটা সাধারণ মানুষের অজান্তেই রয়ে যায়। এক সময় পুকুর চুরির খবর পড়তাম। এখন

'নদী চুরি', 'সাগর চুরি'র খবরও পড়তে হয়। পড়ে চোখে সরষে ফুল দেখি। এক সময় চোখের ধাঁধা কাটে, কিন্তু মনের ধাঁধা রয়ে যায়। তবে মানুষ চোখ দিয়ে তো আর শুধু পত্রিকাই পড়ে না– বাস্তব অবস্থা, পরিস্থিতিকে পড়ে, বোঝে, শেখে। এর নামও শিক্ষা। পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। যার মনে যেটা চায়, সে সেই শিক্ষাটা নেয়। সে মতো কাজ করে। কেউ লুটেরার দলে ভেড়ে কিংবা ভেড়ার জন্য দলীয় গুণগানের কোরাস চর্চা করে। কেউবা লুটেরা শ্রেণি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' পড়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকে। তবে এ দেশের প্রতিটা লুটতরাজের সাথেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে বলে পত্রিকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে এ দেশে ব্যবসায়ের রাজনীতি বা রাজনীতির ব্যবসা– দুটো কথাই সমভাবে খাটে। কিন্তু ব্যবসা বলতে তো আর লুটপাট বোঝায় না, লাভ বোঝায়। বাস্তবে লুটপাট চলছে। রাজনীতির মদদপুষ্ট মতলববাজ দুর্বৃত্ত-দুরাচাররা এগুলো করছে। রাজনৈতিক প্লাটফর্ম দেশের মানুষের সম্পদ মেরে-কেটে খাওয়ার নিরাপদ আখড়া হয়েছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সামাজিক এথিক্সের পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছে। এ সমাজে নীতিবান মানুষের নীতি রক্ষা করে চলা খুব কঠিন হচ্ছে। সাধারণ মানুষের তো বলার কিছু নেই। তাছাড়া তাদের কথা বলার কোনো নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ফোরামও নেই। যা আছে রাজনৈতিক ফোরাম। 'সব শেয়ালের এক রা'। আসলে নতুন সরকার এসে তো আর নতুন মানুষ মঙ্গল গ্রহ থেকে আমদানি করে না। আগের মানুষই থাকে। ট্রেইনিংও সব থাকে। সাধারণ মানুষ যেদিকেই যায় পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ পায়। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। মূলত একটা জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে গেলে লাইনে আনা চাট্টিখানি কথা না! সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা এ দেশের জনগোষ্ঠীকে নিজ গুণে জন-আপদ বানিয়ে ফেলেছি, তাই এত দুর্গন্ধ।

দুর্নীতি এমন একটা সামাজিক ব্যাধি যা দেশের অর্থনীতিকে, মানুষের সুস্থ মানসিকতাকে, সাধারণ মানুষের সহায়-সম্পদকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির নাভিশ্বাস বইয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের যারা আমানতদার তারাই বিভিন্ন ছল-চাতুরিতে ভক্ষক। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নির্বাক। ভক্ষকরা পঙ্কিল রাজনীতির শিক্ষাগুরু, লুটতরাজে মত্ত, জেগে ঘুমায়। দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও চটকদার কথা এদের ধর্ম, রক্ষামন্ত্র, পাথেয়, সামাজিক পুঁজি। রাজনীতি ও উন্নয়নের বুলি এদের সামাজিক ঢাল, রক্ষাকবচ।

দুর্নীতির এই কিঞ্চিৎ উদাহরণ থেকে একটা কথা খোলা চোখে বলা যায়, সুশিক্ষা, সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য অর্থনৈতিক নৈরাজ্যকে ত্বরান্বিত করে।

গবেষণা করে দেখলেও আশা করা যায়, একই ফল খুঁজে পাওয়া যাবে। এ থেকে উল্টো আরেকটা বিষয় ভাবা যায়। অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের দু-একটা চলককে স্বাধীন চলক হিসাবে গণ্য করে দেখা যায়, দেশে সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক নৈরাজ্যের মাত্রা কতখানি; সে-সাথে এ দেশের জনসম্পদের করুণ দশাও ভেসে ওঠে। এসব কথা ভাবতে গেলেই শিক্ষাতে মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলির সম্মিলন ঘটিয়ে দেশে মানবসম্পদ তৈরির গুরুত্ব এসে যায়। দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, সরকারি তহবিল তসরুপকারীকে কখনো মানবসম্পদের সারিতে দাঁড় করানো যায় না।

আমি কোনো সরকারকে কোনো দুর্নীতি বন্ধ করতে বলিনে। কোনো সরকার তা ইচ্ছে করলে পারেও না। সরকার তো কোনো একক ব্যক্তি নয়। তাছাড়া দুর্নীতি একটা সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ। পরিবেশ দিনে দিনে ধ্বংস হয়। পরিবেশ তৈরিও অনেক দিনের ব্যাপার। সরকার একটা সামষ্টিক বা গোষ্ঠী-বর্গীয় পরিচালনা। এজন্য গোষ্ঠীভুক্ত সকলকেই সম্মিলিতভাবে দায়ী করা যায়। দুর্নীতি, দুরাচার, দুর্বৃত্ততা, দুঃশাসন একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর একটা ক্ষয়িত-কুশিক্ষিত-জারিত পরিবেশের অনিবার্য সামাজিক অভিঘাত। উন্নয়নের পরিবেশের ক্রমশই অবনতি ঘটছে। বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এ দেশের শাসনব্যবস্থা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নের পরিবেশ গঠনে ক্রমশ ব্যর্থ হয়ে চলেছে। একটা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-শত্রুভাবাপন্ন সমাজ দিনে দিনে অজান্তেই তৈরি হয়েছে। সমাজে তাই সুশিক্ষা, সুস্থ চিন্তা, সুখ-শান্তি উঠে গেছে। খাজাঞ্চির নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাত থেকে লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে।

উল্লিখিত খবরের পিঠে অনেক কথা চলে আসে। দুর্নীতির মাধ্যমে এভাবে টাকা লুটপাট করে সমাজের একটা অংশ টাকার মালিক হচ্ছে। এতে ধরে নিতে হবে আরেকটা অংশ তার আর্থিক অধিকার ও প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবৈধ টাকার মালিকের সাথে টাকার প্রতিযোগিতায় খেটে-খাওয়া মানুষ টিকতে পারছে না। এতে সমাজে সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশা বাড়ছে। আয়বৈষম্য বাড়ছে। আমরা গড় হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দেখিয়ে বাহবা নিচ্ছি। এমনটি ভাবা অমূলক নয় যে, এই অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকাই বিদেশ ঘুরে সাদা টাকার নামে খোলস বদলে আবার এ দেশে এসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যোগ হচ্ছে। যার টাকা তারই থাকছে। দুর্নীতিবাজেরা অঢেল টাকার মালিক হচ্ছে। যে বা যারা সুযোগ-বঞ্চিত বা সুনীতির কারণে অবহেলিত, বঞ্চিত ছিল, সে বা তারা বঞ্চনার সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। শোষক ও লুটেরাদের হাতে জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত হবে এবং তাদের ভোগ-বিলাসের পর অতিরিক্ত অংশ সামষ্টিক

উন্নয়নের নামে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিয়ে, তার উদ্বৃত্তাংশ আস্তে আস্তে উপচে পড়ে, গড়িয়ে সমাজের মেহনতি-বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এতেই বঞ্চিত শ্রেণি লাভবান হবে। এ তত্ত্ব গত শতাব্দীতেই বাতিল হয়েছে। তবু এ দেশে রেষ রয়ে গেছে। বাস্তবে আমরা এ তত্ত্বেই রয়ে গেছি। আমরা টেকসই কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল হাতে নিতে পারছিনে। যে মডেলই হাতে নিচ্ছি, লুটেরার দল সকল সুবিধা সমূলে সাবাড় করে দিচ্ছে। বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে বণ্টিত অর্থের বৃহৎ অংশ মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে চলে যাচ্ছে। যে ছাগলকেই টেবিলের ওপরে উঠানো হচ্ছে কাঁঠাল গাছের পাতা খেয়ে ফেলছে। আমাদের ছাগল বদল করে ফেলা উচিত। অন্য কোনো প্রাণিকে টেবিলে উঠানো উচিত, যে প্রাণি কাঁঠালের পাতা খায় না। এজন্য আমরা গলদটা না বুঝে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক কাজ করি, তাতে সমাজের উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি হয়। কোনো পথের পরিণতির কথা না ভেবে ব্যবস্থাপত্র দিই, কাজের কাজ হয় না– সময়ক্ষেপণ হয়, সম্পদ নষ্ট হয়। ক্ষতকে সারাতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে ক্ষতের উপর অবিরাম মলম মালিশ করি। একই প্রবণতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করে দলের কাজে খাদক ও দুর্বৃত্ত প্রতিপালন করি। জেনে বুঝেই করি। আসলে কোথাও চতুর্মুখী দুর্নীতি ও লুটপাট হলে, জনগোষ্ঠী যদি মানবিক চরিত্র ধরে রাখতে না পারে উন্নয়নের কোনো মডেলই তখন আর কাজ করে না। কোনো দোয়া-দাওয়াতেই আর কাজ হয় না। মূলত সংশ্লিষ্ট মানুষের চিন্তাধারা ও চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। সুশিক্ষার অভাব, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগহীনতাকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করা যায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়লে ব্যষ্টিক উন্নয়ন সেই তালে বাড়ে না। সামষ্টিক উন্নয়নে শ্রেণিবিশেষ বেশি উপকৃত হয়। তাই সার্বিক উন্নয়ন টেকসই করতে ব্যষ্টিক উন্নয়ন আলাদাভাবে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে করতে হয়। নইলে আয়বৈষম্য, শিক্ষাবৈষম্য ও জীবন-মান বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের বিদ্যমান মডেলের ঢিমে-তেতালা গতিকে ত্বরান্বিত করা আশু প্রয়োজন। তাই নতুন কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের আশ্রয় নেওয়া যায়। এ দেশে সে-কাজ হাতে নিতে গেলেই তো রাজনীতির নামে, জনপ্রতিনিধির পরিচয়ে লুটেরা-খাদকগোষ্ঠী সামনে চলে আসে। বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশ পিঁপড়ের পেটে চলে যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নে এটাও একটা বিবেচ্য বিষয়। বরাদ্দকৃত অর্থ কৌশলে আবার সেই কূটকৌশলী বৈভবশ্রেণির হাতে চলে যায়। এ দেশে বিদেশি বিভিন্ন দাতাসংস্থার কাছ থেকে হরেক কিসিমের এনজিওসহ সরকারের মাধ্যমে তো কম অর্থকড়ি সেই স্বাধীনতার পর থেকেই কম এলো না, কিন্তু লাভের লাভ

কতটুকু হলো? হিসাব কষলে দেখা যাবে এত বিশাল অর্থকড়ি উদ্দেশ্যমতো ব্যয় হলে বঞ্চিত ও গরিব জনগোষ্ঠী এতদিনে অর্থকড়ির ভারে হাঁটা-চলা করতে পারতো না, অর্থের নীচে চাপা পড়ে যেত। পরিসংখ্যানের তথ্য দিয়ে বিস্তারিত শিবের গীত এখানে গাইতে চাচ্ছিনে। এ ঘটনাও সুশিক্ষার কথা মনে করিয়ে দেয়। জনগোষ্ঠী যদি জন-আপদ হয়, তাহলে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ উন্নয়নের নামে একটা শ্রেণি সাবাড় করে দেয়। একটা শ্রেণি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগ পাবার আশায় ইনিয়ে-বিনিয়ে সব সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলে ভেড়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ একটা রাজনৈতিক টাউট শ্রেণির জন্ম নেয়। উদ্দেশ্য ঐ একটাই– চেটেপুটে পেট ভরা। সেজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল বানাতে গেলে প্রথমেই খাদক সম্পৃক্ততা যার-পর-নাই কমাতে হবে। দম্পতি এইডসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখতে বলতে হবে। আলাদা একটা নীতিবান সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠীর হাতে অর্থ ও সেবা বণ্টনের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠী তাদের স্বচ্ছ মেধা, শিক্ষা-সামর্থ্য ও সেবা দিয়ে সমাজ-পরিচালনার কাজ করবে। সমাজে আবার সুশিক্ষা সুস্থ মানসিকতার আবহ ছড়িয়ে দেবে। সুশিক্ষার ছায়াতলে মানুষকে আনবে। চেষ্টা চলবে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়নে। জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ জনসম্পদ বানাবে। জাতি মুক্তি পাবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, জনগোষ্ঠী গরিব বলেই কি আমরা দুর্নীতিবাজ, মতলববাজ ও মানসিকতা নীচু? না-কি মানসিকতা নীচু ও মতলববাজ বলেই কুটিল, অনুন্নত ও গরিব? আমার মনে হয়, অশিক্ষা ও মানসিকতা নীচু বলে আমরা গরিব ও অনুন্নত। জটিল-কুটিল জনগোষ্ঠীর জন্য জটিল সিস্টেমের দরকার হয়। আবার সিস্টেম যত জটিল হোক না কেন, কুটিল মানুষ কুটিল বুদ্ধি করে তা ভাঙতে সক্ষম হয়। কারণ প্রতিটা সিস্টেমের পিছনেই মানুষ কাজ করে। প্রতিটা পর্যায়ে মানুষ সৎ না হলে সিস্টেম ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বসবাসরত মানুষের সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আগে। মানুষের সুষ্ঠু চিন্তাধারা ও শিক্ষায় গলদ থাকলে তাদের নিয়ে উন্নয়নের কাজে আদৌ এগোনো যায় না। সেজন্য জন-আপদকে সুশিক্ষিত মানুষ বানানোর প্রক্রিয়া আগে। তাহলে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রণ, সুস্থ চিন্তা, জীবনের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

আমরা উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনগোষ্ঠীর কথা, টেকনিক্যাল শিক্ষার কথা বার বার বলি। অথচ এ কথাটা একেবারেই এড়িয়ে যাই যে, দক্ষ ও টেকনিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী লোকজন সুশিক্ষিত না হলে টেকনিক্যাল চোর-ডাকাত ও সাধারণ মানুষকে ঠকানো কিংবা দেশের খাজাঞ্চি লুট করার জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধর হয়। তারা নিজেরাই দেশজুড়ে একটা দুর্নীতির বলয় কৌশলে তৈরি করে নেয়, যদি হাতে

ক্ষমতা থাকে। সেজন্য ক্ষমতা ও দুর্নীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যদি সিস্টেমের স্বচ্ছতা না থাকে। আবার মানুষ ছাড়া কোনো সিস্টেম সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেও না। তখন সেই মানুষটা কি আসলেই মানুষ, না দক্ষ চোর-ডাকাত, তা বিবেচনায় আনতে হয়। তাই মানুষকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এখানে অন্য আরেকটা সমস্যা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে কাজ করে। আমাদের অনেকেই নিজের চিন্তা-চেতনাকে প্রতিফলিত করে ধরেই নিই যে, মানুষমাত্রই দুর্নীতিবাজ। সুযোগ পেলেই দুর্নীতি করবে। তাই দায়-দায়িত্ব বণ্টনের সময় মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আর বিবেচনায় আনিনে। যা হবার তাই হয়। আসলে বাস্তবতা তা বলে না। প্রতিটা সমাজেই নীতিবান ও দুর্নীতিবাজ লোক উভয়ই থাকে। সহনীয় অনুপাতে আছে কি না এটা বিবেচনার বিষয়। আমাদের সমাজে নীতিবান লোক এখনো আছে, সংখ্যাটা হয়তো একটু কমে গেছে। তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নেই। তাই তাদের করারও কিছু নেই। যাদের বলদর্পী দাপট ও ক্ষমতা আছে; যোগ্যতাও নেই, সততাও নেই, মুখসর্বস্ব বুলি আছে– তারাই বর্তমান সমাজ বিবেচনায় যোগ্য। ভুলটা এখানেই। অর্থাৎ আমরা ঠিক মানুষটাকে ঠিক কাজের জন্য ঠিক জায়গাতে বসাইনে। আগে নিজের বৈশিষ্ট্যের পজিটিভ পরিবর্তন করা, তারপর পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের মানুষকে অন্বেষণ করা জরুরি। তারপর দায়িত্ব বণ্টন। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে, খাজাঞ্চি পাহারার কাজে, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবহারের কাজে আমরা সচরাচর এসব ফ্যাক্টর আমলে নিইনে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, সুশিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যে মূলত অর্থনৈতিক সম্পদ, তা আমরা রাষ্ট্রীয় বা দেশের কাজে আদৌ বিবেচনায় নিইনে। তাই এই দুর্গতি নিয়েই আমাদের নিত্য বসবাস। দেশে মানবসম্পদ তৈরির গুরুত্ব এখানেই।

প্রসঙ্গত, দেশে মানুষের মতো মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদ গড়তে জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষ জাতিকে অন্য কোনো প্রাণি থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। এই শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুই-ই হতে পারে। সামাজিক শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার ওপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, আদর্শ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নতি একটা জাতিকে উন্নতির শিখরে বয়ে নিয়ে যায়। কার্যত আমাদের দেশে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়াতে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি।

অনেক জায়গাতেই লিখেছি, শিক্ষা বলতে আমি লেখা, পড়া ও অঙ্ক জানা লোকদের বুঝিনে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আরো কয়েকটা উপাদান বা গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সবার আগে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটা। শিক্ষার ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিটা মানুষের (হোক আস্তিক, হোক নাস্তিক) কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে ভালো পথে চলার ও মায়া-মমতা দিয়ে পরিবার নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম জনসম্পদের বুনিয়াদ সৃষ্টির একটা মূল উপাদান। তাই শিক্ষাকে ধর্মচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য সেকিউলারিজম ('নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ') তত্ত্বকে বাদ দিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হবে। গবেষণা বা অনুসন্ধানও শিক্ষার অন্যতম উপাদান ও গুণ। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা হাজামজা, নিশ্চল এক জলরাশি। শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়। তারপরই শিক্ষা পূর্ণতা পায়। তাই শিক্ষায় গভীরভাবে ভাবতে শেখা আনতে হবে। আরো যে দুটো উপাদান বা গুণ শিক্ষায় থাকতে হবে, তা হলো জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠা। শিক্ষায় মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সে শিক্ষা নিষ্ফলা ন্যাড়া ক্ষেতের সমান। ন্যয়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, অহিংসা, দেশপ্রেম, মিথ্যা-শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি। এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণের মাত্রা যার মধ্যে যত বিস্তৃত হবে, সে তত শিক্ষিত। এই শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি। আমার মতে, এ দেশের মানবসম্পদ গঠনে একজন মানুষের মধ্যে শিক্ষায় তিনটি অপরিহার্য গুণগত বিশেষত্ব থাকতে হবে: ১. জীবনমুখী শিক্ষা– এ শিক্ষা জীবনের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তৈরি করবে, সমাজ ও পরিবেশকে বুঝতে ও সে মতো চলতে শেখাবে, বাস্তবধর্মী সাধারণ জ্ঞান দেবে, ভাবনা-চিন্তার গভীরতা দেবে ইত্যাদি। ২. কর্মমুখী শিক্ষা– এ শিক্ষা মানুষের কোনো না কোনো কাজ বা পেশায় বিশেষত্ব আনবে, প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে ইত্যাদি। ৩. মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা– সততা, অহিংসা, দেশপ্রেম, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। এই তিনটা বিশেষত্ব একটা মানুষের মধ্যে থাকলে তাকে মানবসম্পদ বলবো। এ মানবসম্পদ তার নিজের, সমাজের ও দেশের সম্পদ হিসেবে কাজ করবে। সমাজ, দেশ ও জাতি গড়তে গেলে

অনেক কিছুকেই মগজে ঠাঁই দিতে হয়। আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে অসংখ্য দিকনির্দেশক ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় আনতে হয়, ভাবতে হয়। পরিকল্পিতভাবে সমাজ গড়তে হয়। সে মতো পরিকল্পিতভাবে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। তারপর উন্নত দেশ ও দীপ্তিমান জাতি গড়ে ওঠে। সে জাতির আলোকপ্রভা দিনে দিনে বিশ্বের সকল শ্রেণির সকল মানুষের চেতনার গহন কন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব করতে গেলে একদল সমভাবাপন্ন সুশিক্ষিত দূরদর্শী পরিচালক লাগে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদারনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ, পুঁজিবাদ ও সেকিউলারিজম থেকে ক্রমশ সরে আসতে হয়। দেশীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামুদয়িক শিক্ষা ও অহিংস ধর্মপালনের চর্চা করতে হয়। অভাবী-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটা বড় অঙ্কের ভাগ দিতে হয়। এটা রাষ্ট্রের দয়া না, এটা তাদের অধিকার। দেশের ধর্মগুরুদের সৃষ্টি-উদাসী বেহেশত যাবার সটান (শর্ট-কাট) তরিকা বদল করে কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সৃষ্টিসেবার দিকে মন দেবার জন্য আহ্বান জানাতে হয়। একটা টেকসই ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলকে গ্রহণ করতে হয়। দৃঢ়-শক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। দেশব্যবস্থায় মিথ্যাবাদী, অজ্ঞ, মূর্খ, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানদের বাদ দিয়ে ন্যায় ও সত্যের অগ্রপথিক, সুস্থ-সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হয়। তখন রাষ্ট্রের নাম হয় কল্যাণরাষ্ট্র।

এসব কথা একটু বেশি বলতে গেলেই সেই প্রথমে বলা জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়নের প্রসঙ্গ চলে আসে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পাঁচটি সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক ব্যবহার প্রয়োজন– মানুষ, আহরিত ও উৎপাদিত মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং অর্থসম্পদ। এগুলোর মধ্যে মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং অর্থসম্পদ নিষ্প্রাণ, অচেতন ও জড় সম্পদ। একমাত্র মানুষই জীবন্ত ও সজীব সম্পদ। অচেতন ও জড় সম্পদ নিজে নিজে কিছু করতে পারে না, সে সক্ষমতাও তাদের নেই। উন্নতি নির্ভর করে এই জীবন্ত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অচেতন ও জড় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তার ওপর। জীবন্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও দক্ষ ব্যবহার আবার নির্ভর করে বসবাসরত মানুষের দক্ষতা, মানসম্মত যোগ্যতা, জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও মনোভাব এবং মানবিক চরিত্রের ওপর। একটা দেশে অঢেল সম্পদ থাকলেও সুযোগ্য ও যথার্থ ব্যবহারের অভাবে জনগোষ্ঠী দুর্দশাগ্রস্ত, অনুন্নত ও মানব জাতির কলঙ্ক হতে পারে। অচেতন ও জড় সম্পদ সৎ বা দুর্নীতিবাজ হতে পারে না। মানুষ তথা জনগোষ্ঠী ‘জন-আপদ’ বা ‘জনসম্পদ’ হতে পারে। ব্যতিক্রম বাদে জন-

আপদ হয়ে কেউ জন্মায় না; আমরা নিজেরা সিস্টেম করে জন-আপদ গড়ে তুলি। জনগোষ্ঠী জন-আপদ হলে রাষ্ট্রীয় সুশাসন, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ্য জাতিগঠন দুর্বৃত্ত দুঃশাসন, দুর্বিনীত দুরাচার ও দুশ্ছেদ্য দুর্গ্রহে রূপ নেয়। দেশের যাবতীয় সম্পদ প্রকাশ্যে লুটপাট করে কোনো এক গোষ্ঠী পকেটে ভরে। দেশের অসচেতন সাধারণ মানুষ এজন্য অজ্ঞতাবশত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, বুক চাপড়ে সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না। এসবই জন-আপদ তৈরির পরিণাম। এটা একটা 'ভিসাস সার্কেল'। আমরা এই 'ভিসাস সার্কেল'-এ (দুষ্ট আবর্তে) পড়ে গেছি। বেরিয়ে আসাটা অতটা সহজ নয়। এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া যে যত কথাই কোরাস ধরে বলুক, প্রকৃত মুক্তি নেই। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে, জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ও মানসম্মত দক্ষতা ও সুশিক্ষা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুষ্ট আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সূচনা হিসেবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতেই হয়। তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে:

– সমাজের প্রতিটা মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

– সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

– স্বাস্থ্যসেবা, দরিদ্র-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে দান এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

– ছাত্রছাত্রীদের ব্যবসায়, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

– সেই সাথে ছাত্রছাত্রীদের এবং যুবসমাজের বহুমুখী কারিগরি জ্ঞান, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

শুরুটা জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা দিয়ে করা দরকার। এটাও একটা উন্নয়ন মডেল। কোনো কাজ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। এজন্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে জনসম্পদ খুঁজে বের করা দরকার। একটা শিক্ষা-সমাজ (একদল লোক) দরকার, সামাজিক সংগঠন

দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ দেশব্যাপী তৈরি করা দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ সুশিক্ষার আদর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা তথা মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে ও সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও থাকবে। আমাদের সমাজে গরিব, অসহায়, আর্ত-পীড়িত, খেটে-খাওয়া মানুষের টিকে থাকার জন্য, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য-সেবা ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করবে। এ উদ্দেশ্যে একটা ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের কোনো বিকল্প নেই।

সমাজের সুশিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠী একটা সামাজিক শক্তি। সকল মানুষের সাথে সমাজেই তাদের বসবাস। সমাজে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন বা ভালো-মন্দ তাদের জানা। তাদেরকে শিক্ষা-সেবার সমাজহিতৈষী লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দলবদ্ধ (গ্রুপ) হতে হবে। এরা সমাজের এক-একটা ওয়ার্ক-গ্রুপ। এই গ্রুপ স্বশাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী। এই গ্রুপের নাম হবে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'। এরা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না; অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করবে না। নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতির লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করবে না। তারা 'সুশিক্ষাই জীবন ও সমাজের উন্নতি' এ কথার মর্মবাণী জনে জনে মানুষকে বোঝাবে। তারা সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নীত করবে, সামাজিক শিক্ষা দেবে; সুশিক্ষিত, সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করবে ও সমাজসেবা দেবে। এতে সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। মন-মানসিকতার উন্নতির ফলে উন্নতি হবে আর্থিক অবস্থারও। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনে জনে সরাসরি নিড-বেইসড আর্থিক সহায়তা দেবে, যেখানে অর্থের সিস্টেম-লস হবে না। ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ করবে। মানুষ ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। বারো বছরের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জায়গা করে নেবে। সমাজ ও দেশ থেকে ক্রমশই দুর্নীতি, দুঃশাসন, অব্যবস্থাপনা দূর হবে। প্রথম পাঁচ বছরের পর ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণে পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সাথে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এখানে কোনো নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকবে না। থাকবে জনসেবার ক্ষমতা। সমাজসেবকরা সেবামূলক কাজ করার কারণে সমাজের মানুষের ভক্তি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পাবে। যে যত বড় জনসেবক সে-ই তত বড় নেতা। ত্যাগের মহিমাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। এটাকে সামাজিক রেওয়াজে একবার পরিণত করে দিতে পারলেই সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিণত হবে। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার ফিরে আসবে।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ' জনগোষ্ঠীর একটা আলোকিত, সুশিক্ষিত, স্বেচ্ছাসেবী অংশের অংশগ্রহণে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা ও

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত। সরাসরি শিক্ষা ও আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য এমন কোনো সামাজিক সংগঠন এ দেশের সমাজ-অঙ্গনে এর আগে কখনো কাজ করেনি। সরকারের ইতিবাচক মনোভাব ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' নিঃসন্দেহে এ দেশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা-সেবা সমাজ সরকারের যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রভৃতির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য সাথে নেবে। সরকারি ও বেসরকারি সমাজ-উন্নয়ন সংস্থার জনহিতৈষী কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। শিক্ষা-সেবা সমাজের জনকল্যাণমুখী উদ্দেশ্যের কারণেই দেশে যখন যে সরকারই থাক না কেন, দেশের উন্নয়নকল্পে এ সমাজকে সাথে নিয়ে কাজ করবে। শিক্ষা-সেবা সমাজকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। গরিব-মেহনতি, অসহায় মানুষের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে করবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ একটি আদর্শ সংগঠন, যেটি কর্ম ও সেবার প্রতিটা পর্যায়ে ও প্রতিটা পদক্ষেপে উৎকৃষ্টতা দেখাবে, জনমানুষের আস্থার সাথে কাজ করবে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখবে। প্রতিজন সদস্য হবেন সততা ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত। সরকার আর্থিক বছরের মোট বাজেটের শতকরা পাঁচ ভাগ অর্থ অসহায়, দরিদ্র, আর্ত-মানবতার সেবার জন্য বরাদ্দ রাখতে পারে, যা শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে খাতভিত্তিক পণ্যে বণ্টিত হবে। এ সহায়তার অর্থ কোনো নগদ অর্থে দেওয়া হবে না। পুরোটাই পণ্যে প্রদান করতে হবে। এ সহায়তা কোনো ঋণ আকারে হবে না, তাই কোনো সুদও থাকবে না। সহায়তা গ্রহীতারা তাদের সাধ্যানুসারে স্বল্প পরিমাণ কিস্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে পারলে পরিশোধ করবে।

দেশব্যাপী 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' পরিচালনার জন্য, তাদেরকে সমাজসেবার কাজে সহায়তা করার জন্য, নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য, সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা কেন্দ্রীয় কমিটি থাকা প্রয়োজন। এটা প্রধান নীতিনির্ধারণী পরিচালকসভা হিসেবে কাজ করবে। এর নাম 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ হবেঃ নীতিমালা প্রণয়ন, ওয়ার্কিং প্লান তৈরি, শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিটা সদস্যের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-সেবা সমাজ ও জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য উন্নত মানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সেবার বিষয়ে সরকার ও যে কোনো

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা, গবেষণা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষা-সেবা সমাজ একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর সমাজের সচ্ছল সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করাতে পারে। সেখানে প্রতিটা কোম্পানিতে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন শেয়ার মালিকের ব্যবস্থা করা যায়। কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হবে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজে মনোযোগী হওয়ার ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পানির বাৎসরিক লাভের দশ শতাংশ তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রাখতে পারে। এছাড়া কোম্পানি লাভের দশ শতাংশ 'কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি'র জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজ উন্নয়ন ফান্ড'-এ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা-সেবা সমাজ এ ফান্ড ও অন্য আরো ফান্ড ব্যবহার করে সমাজ-উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কাজ করতে পারে। মানুষকে দিয়ে সব কিছুই সম্ভব। দরকার রাজনৈতিক কূটচালে মানুষ ও সমাজকে আসক্ত না করে নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিকভাবে মানুষ ও সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করা। মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবিক গুণ জাগিয়ে তোলা। সমাজে মানুষকে মানুষের মতো প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য দরকার একটি আদর্শ সমাজ সংগঠন। সব কিছুর মূলে থাকা দরকার শিক্ষা, সততা, উন্নত মানসিকতা ও ইচ্ছাশক্তি। আর্থিক স্বচ্ছলতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আগেই বলেছি, উন্নয়ন মানে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন। তাই সততা এবং উন্নত মানসিকতা বিনিয়োগ করলে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে এ কথা সত্য ও পরীক্ষিত।

আমাদের সমাজে, এমনকি বিশ্ব-সমাজেও একটা পক্ষ আছে, যারা উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনের কথা অনুভব করেন, জোর দিয়ে বলেন। কিন্তু জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ বানাতে হলে শিক্ষায় সততা, ধার্মিকতা, দেশীয় মূল্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, জাগ্রত-বিবেক, মনুষ্যত্বের গুণ ভিত্তিমূল হিসেবে আনতে হবে, শিক্ষার্থীর মধ্যে এ গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দিতে হবে তা ঘুণাক্ষরেও বলেন না, ব্যবস্থাপত্র দেন না বা অজানা কারণে সুকৌশলে এড়িয়ে যান। তাই জনগোষ্ঠী দক্ষ হয় বটে, দক্ষ মানব-আপদ হয়, চোরা-হাতে ও লুটকর্মে দক্ষ হয়। কারণ মানুষ তো স্বজ্ঞা, প্রজ্ঞা ও স্বতঃলব্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ বোধশক্তি দিয়ে চালিত। এ সবই বাস্তবতা।

আবার অন্য কথা বলি। আমার বাসাবাড়িতে কাজের মেয়ের সংকট অনেক দিন ধরেই চলছে। বেতনও বেশি চায়। জোগান কমে গেছে। এরা সবাই গার্মেন্টস

ফ্যাক্টরিতে চলে গেছে। বেতনও অপেক্ষাকৃত ভালো। একটা সম্মানজনক অবস্থায় স্বাধীনভাবে আছে। সামাজিক একটা অবস্থানও আছে। অন্তত বাসা-বাড়ির কাজের মেয়ে হওয়ার তুলনায় ভালো আছে। রহমতুল্লার ছেলে-নাতিরা চাষ ও দিনমজুরির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তারা লেখাপড়া শিখে অন্য কোনো সেবাধর্মী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজে ছড়িয়ে পড়লে চাষকাজের ওপর শ্রমিকের চাপ ও জোগান কমে যেত। শ্রম-জোগান কমে গেলে কৃষিকাজে শ্রমিকের মূল্যও বাড়তো। আবার কৃষিকাজের শ্রমিকও শিল্পমুখী হতো। জীবনের মানোন্নয়ন হতো। সুশিক্ষা নিয়ে চাষ বা অন্য কাজ করলে সহজে উন্নতি করতে পারতো। পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতো। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সুশিক্ষা, জীবন ও কর্মমুখী টেকনিক্যাল শিক্ষা দিয়ে মানুষকে গড়ে শিল্পমুখী ও সেবামুখী করে তোলা যায় ততই ভালো। আবার এই শিল্পগুলো কৃষিপণ্যভিত্তিক এবং জেলা-শহর ও গঞ্জের নিকটে হলে ভালো। কাঁচামাল ও শ্রমের নৈকট্য পাওয়া যায়। শিল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গ্রামের বাড়িতে থেকেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে পারে। গ্রামে জীবনযাত্রার ব্যয় কম হওয়াতে বিভাগীয় শহরের তুলনায় কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে শ্রম-সরবরাহ ক্রমশ ভারসাম্যে উপনীত হয়। এই কাজগুলোর কথা আমরা বলি। অনেক কথাই বলি। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করতে, পরিবেশ নিশ্চিত করতে অযথা সময় পার করে ফেলি। উদ্দেশ্যকে একবার নির্ধারণ করে ফেললে এর গতিশীলতা বাড়ানো দরকার, সে মেকানিজমও আছে। এই করছি করছি করে, ভালো ভালো করতে করতে যুগ যুগ কাটিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। অথচ এটা আমাদের জাতীয় স্বভাব।

রহমতুল্লাহর ছেলে-নাতিরা কদাচিৎ বড় বড় শহরে যায়। কদাচিৎ গাড়িতে চড়ে প্রশস্ত রাস্তা বেয়ে বড় সেতু পার হয়ে শহরে ঘুরে বেড়ায়। তারা গ্রামের বাড়িতে, মাঠে ও গ্রামের পাশের বাজারে চলাচল সীমাবদ্ধ রাখে। তাদের মতো এ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। ফলে প্রশস্ত রাস্তা ও বড় সেতুর উপযোগিতা এদের কাছে কম। সামষ্টিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা রহমতুল্লাহর উত্তরাধিকাররা কম ভোগ করে। তাই সুষম উন্নয়ন করতে হলে সামষ্টিক উন্নয়নের পাশাপাশি নির্দিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ব্যষ্টিক (ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি) উন্নয়ন মডেল দরকার। এ মডেলে যেন কেউ রাজনীতির ধুয়ো তুলে মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে টাকা-পয়সা গায়েব করে না দিতে পারে সেটাও দেখতে হবে। রাজনীতির ধুয়ো তুলতে দিলেই কোনো স্বচ্ছতা থাকবে না, আবার দোষী ব্যক্তিকে বিচারের আওতায়ও আনা যাবে না। দলের লোকজন পুষতেই টাকা সব ব্যয় হয়ে যাবে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ অনেক বেড়েছে, আরো বাড়বে। এ দেশে টাকা ও সম্পদের অভাব কোনো উন্নয়নের পথে বাধা না। বাধা অসততার, দুঃশাসন, দুর্বৃত্তায়ন, স্বার্থবাদী খলচরিত্রের লোক, দুর্নীতি ও মিথ্যাচার।

এতে বোঝা যায়, ব্যষ্টিক উন্নয়ন ছাড়া জনগোষ্ঠীর সুষম সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যষ্টিক উন্নয়ন করা দরকার। ব্যষ্টিক উন্নয়ন হলে সামষ্টিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ব্যষ্টিক উন্নয়নের জন্য একদল সৎ, নিবেদিতপ্রাণ আলোকিত, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী থাকবে (যাকে আমরা সংক্ষেপে মানবসম্পদ বলি)। এই জনগোষ্ঠী হবে অর্থনৈতিক শক্তি, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করবে, জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। এতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধিত হবে।

ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলটাকে এভাবে রেখাঙ্কিত করা যায়:

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন মানসিকতার লোক আছে। তাদের মধ্য থেকে সুশিক্ষিত, ত্যাগী, স্বেচ্ছাসেবকদেরকে বেছে নিতে হবে। দেশের প্রতিটা এলাকায় ছোট ছোট গ্রুপে এদেরকে ভাগ করতে হবে। কর্ম এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। তারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ('শিক্ষা-সেবা সমাজ' নামে) হিসেবে নিজ নিজ এলাকায় তিনটি কাজ করবে।

ক. আওতাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাথে নিয়ে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। সমাজের প্রতিটা মানুষকে সুপরামর্শের মাধ্যমে শিক্ষার দিকে ডাকবে। সাধারণ মানুষকে ভালো কাজ ও সুচিন্তার প্রশিক্ষণ দেবে। মানবিক গুণের ও সফট স্কিলের প্রশিক্ষণ দেবে। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করবে। প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততিকে স্কুল/মাদ্রাসায় দিয়ে সুশিক্ষিত করার পরামর্শ দেবে এবং শিক্ষা-কার্যাবলির সার্বক্ষণিক তদারকি করবে। টেকনিক্যাল শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকমহলকে উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষক ও অভিভাবকমহলকে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে বলবে। অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে শিক্ষকদের ওপর এবং নিজেরা বুঝিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সহনশীল চাপ অব্যাহত রাখবে, যাতে শিক্ষার মান, শিক্ষায় সততা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জন্য বয়স্ক সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এতে অল্প সময়েই শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। মানুষকে সামাজিক কূটচাল, কুবুদ্ধি, পারস্পরিক হানাহানির পরিণাম সম্বন্ধে ধর্মীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে বলবে ও এগুলো থেকে মুক্ত হতে পরামর্শ দেবে। তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। মানুষ ক্রমশ জনসম্পদে রূপ নেবে, আলোকিত সমাজ গড়ে উঠবে।

খ. বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে গরিব, অভাবী, দুঃস্থ, এতিম, রোগাক্রান্ত, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থ-সম্পদ দান হিসাবে পুনর্বণ্টন

করবে। সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে তুলবে (অর্থাৎ তাদের জন্য ইনকাম জেনারেইটিং অ্যাসেট তৈরি করে দেবে)। কোথাও থেকে আর্থিক সহায়তা ফেরত পাবার পর সে অর্থ দিয়ে আবার অন্যজনকে সহায়তা করা যাবে। ফলে একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে অনেকজন উপকৃত হবে।

গ. প্রতিটা এলাকায় অল্প-পুঁজির লোকগুলোকে একত্র করে ছোট ছোট কোম্পানি গঠনের ব্যবস্থা করবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবে। সেখান থেকে প্রাপ্ত লাভের অংশ শিক্ষা-সেবা সমাজের ফান্ডে এসে জমা হবে। সে-ফান্ডের একটা অংশ পুনরায় অভাবী, দুঃস্থ, এতিম, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দান হিসেবে বণ্টন করবে। অন্য অংশ সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা দিয়ে মানুষকে কর্মমুখী করে তুলবে, মানবকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করবে।

এভাবে সততা, সুশিক্ষা ও আর্থিক সহায়তা সমাজে বিনিয়োগ করলে সমাজ অল্প সময়ে সুশিক্ষিত সমাজ, মানবসম্পদ, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি দেশকে প্রত্যর্পণ করবে।

ওপরে যে শিক্ষা-সেবা সমাজ ও কাজগুলোর কথা বলা হলো, তা বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে থেকে করা সম্ভব। কিন্তু স্থানীয় সরকারের নামে যে খাদকশ্রেণির উদ্ভব হয়েছে এবং প্রতিদিনের পত্রিকার মাধ্যমে তাদের যে পচা-দুর্গন্ধযুক্ত কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে, তাতে এ সবের কোনো একটা কাজও তাদেরকে দিয়ে বর্তমানে করাতে গেলে কাজটা সমূলে মুখ থুবড়ে পড়বে, এটা নিশ্চিত। পরশ পাথরের পরশেই সোনা তৈরি হয়। গুণটা সোনার না, পরশ পাথরের। শিক্ষা-সেবা সমাজ যদি তাদের যোগ্যতা, কর্মকৌশল, সুশিক্ষা ও সততার গুণে নির্ধারিত কাজগুলো বিশ্বস্ততার সাথে সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, তবে অবস্থা বুঝে ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকারের আইনে কিছু পরিবর্তন এনে, সেখান থেকে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা মুক্ত করে শিক্ষা-সেবা সমাজের সাথে মার্জ করে দেওয়া যায়। এতে শিক্ষা-সেবা সমাজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সেটা দূর ভবিষ্যতের কথা। আগে শিক্ষা-সেবা সমাজ ভিন্ন আঙ্গিকে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করবে।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন এবং এর নীতি ও কর্মনির্ধারণে একটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে।

৫.

শিক্ষা-সেবা সমাজ

এখন শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও গঠন, কর্মপদ্ধতি ও জবাবদিহিতা কেমন হতে পারে, তা নিয়ে ভাবা যাক–

প্রকৃতি: সমাজের প্রতিটা সদস্যের পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবেন এবং সমাজের প্রত্যেককেই স্ব-স্ব ধর্ম পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ মানে সংশ্লিষ্ট সমাজেরই অভ্যন্তর ভাগ থেকে মানবিক গুণের ভিত্তিতে বাছাইকৃত একদল সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, সেই সমাজেই যাদের বসবাস। তাদের সমাজের প্রতিটা মানুষকে তারা চেনেন-জানেন। একে অন্যের সাথে সামাজিক ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজের মানুষের সাথে আজন্ম তাদের সখ্য; একে অন্যের অনেক সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ, সহযোগিতা সমাজের মানুষ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। তারাও তাদের সমাজের মানুষকে সহযোগিতা করে মানসিক তৃপ্তি পাবেন, আবার তাদের মানব-সেবা ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে, যার প্রতিদান তারা পরজগতে পাবেন। এরকম একটা পরিবেশকে ভালো পথে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে সুশিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। সরকারিভাবে লোকবল নিয়োগ করে এ জাতীয় সমাজসেবা দিতে হলে সমাজসেবার ব্যয় অত্যধিক হয়ে যাবে। অথচ এখানে কোনো খরচ নেই। বিনামূল্যে সমাজের মানুষ সমাজসেবা পাবেন। শুধু প্রক্রিয়াটা একবার চালু করে দিতে পারলেই হবে এবং পরবর্তী সময়ে এটা সামাজিক প্রক্রিয়ারও একটা অংশ হিসেবে রূপ নেবে। আবার এটাকে চালু রাখতে পারলে ভবিষ্যতে সমাজ-সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে দেখা দেবে। সমাজ পরিবর্তনশীল। দীর্ঘ বছরে সমাজের যে নেগেটিভ পরিবর্তন হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় সমাজ পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ একটি স্বশাসিত, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটা সদস্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অহিংস মনোভাবে বিশ্বাসী হবেন। প্রতিটা সদস্য সম্প্রদায়-সুহৃদ হবেন। প্রতিটা সদস্যের রাজনৈতিক দলের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন থাকতে পারে, তবে তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবেন না।

শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিটা সদস্যকে সমমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সমাজসেবার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় তারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। শিক্ষা-সেবা সমাজের সব কার্যক্রম ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে। প্রতিটা কাজের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শ ফুটে উঠতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের সাথে সংগঠনের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সাধারণ মানুষ সংগঠনের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে।

উদ্দেশ্য: ১. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে শিক্ষার জন্য ত্রি-পক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিটা পক্ষকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। বিশেষভাবে অভিভাবকমহলকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে শিক্ষা ও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে ‘ফুল-টাইম স্কুলিং’ ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাওয়া। শিক্ষক ও অভিভাবকমহলকে বুঝিয়ে শিক্ষায় সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনা। সমাজের মানুষকে জনে জনে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুশিক্ষা বেগবান করা। অভিভাবকদের বুঝিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠানো। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করা। শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা-সচেতনতা ও উন্নত চিন্তাধারা আনয়নে নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা। সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা।

২. স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

৩. গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (ব্যক্তির আয়-রোজগার সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করে দেওয়া)। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা।

৪. ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ সমাজের সচ্ছল সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করার পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হবে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজে মনোযোগী হওয়ার ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পানির বাৎসরিক লাভের দশ শতাংশ তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রাখতে পারে। এছাড়া কোম্পানি লাভের আরো দশ শতাংশ ‘কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি’র জন্য ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ উন্নয়ন ফান্ড’-এ অবদান রাখবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ এ ফান্ড ও অন্য আরো ফান্ড ব্যবহার করে সমাজ-উন্নয়নমূলক, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও সেবাধর্মী কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ বিনা ফি-তে কোম্পানি গঠন ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেবে।

গঠন: ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন মূলত সমাজের অশিক্ষিত-কুশিক্ষিত, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে উন্নতি ও উৎকৃষ্টতার পথে নিয়ে যাবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যা ধার্মিক লোকদের জন্য একটা ইবাদতও বটে। ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’-এর আওতা হবে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার পরিবার বা তার কিছু বেশি-কম। প্রত্যেক পরিবারকে একটা একক হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রথমত এক বা একাধিক সমাজসেবক উদ্যোগ নিয়ে সমাজের মধ্য থেকে এগারো থেকে সতেরো সদস্যবিশিষ্ট একটা ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন করবেন। এই এগারো থেকে সতেরো জন সদস্যকে ‘সোসাইটি কাউন্সিলর’ বলা হবে। প্রথমে কাউন্সিলরের সংখ্যা কম হলেও সমস্যা নেই। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত, খারাপ চরিত্রের মানুষ যেন কাউন্সিলে না ঢুকে পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু স্বার্থত্যাগী সমাজসেবকদের জায়গা দিতে হবে। প্রত্যেকে শিক্ষা-সেবা সমাজের ‘সোসাইটি কাউন্সিলর’ হিসেবে পরিচিত হবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে একজন ‘প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর’ নির্বাচিত হবেন। একজন সেক্রেটারি ও একজন ক্যাশিয়ারও নির্বাচিত হবেন। প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর, সেক্রেটারি ও ক্যাশিয়ারের পদের মেয়াদ হবে তিন বছর। প্রতিটা পদ হবে পালাক্রমে বা পর্যায়ক্রমে। প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর কাউন্সিল সভায় কাউন্সিলের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদান্তে অথবা যে কোনো সময় অন্য কোনো কাউন্সিলরকে প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর, সেক্রেটারি বা ক্যাশিয়ার হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর, সেক্রেটারি বা ক্যাশিয়ার পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। একজন কাউন্সিলর প্রধান সোসাইটি

কাউন্সিলর না হয়েও নিজ উদ্যোগে অন্য কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে সমাজের কাজ করতে পারবেন। আবার একজন প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর পরবর্তী মেয়াদে সেক্রেটারি বা ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এখানে পদের তুলনায় কর্মোদ্যোগ ও কাজ প্রাধান্য পাবে। কাউন্সিলের সভায় সমাজ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্ব সমাজ-সদস্য নিয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকবে। কমিটির প্রত্যেকে 'ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য' বলে গণ্য হবেন। কাউন্সিল কথা, কাজে ও চিন্তায় গ্রামীণ দলাদলি, ক্ষুদ্র-মানসিকতা, ব্যক্তি-স্বার্থ, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, গ্রুপিংয়ের ঊর্ধ্বে উঠে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর প্রত্যেক সদস্য এককভাবে দেশের প্রচলিত আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সমাজের এক বা একাধিক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ অর্থাৎ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' পরিষদের নিয়মকানুন মোতাবেক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' বা 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আভিযোগের বিষয়টি মীমাংসা করবে বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে, সমাজে এক শ্রেণির লোক আছে, যাদের পুরো মগজটাই কুটিল বুদ্ধি ও বিকৃত চিন্তায় ভরা। এরা সমাজের ভালো কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না বা বুঝতে চায় না, অথচ মাতব্বরিটা করতে চায়। গ্রুপিং, অন্তকলহ, দলবাজি, আত্মস্বার্থে মত্ত থাকে। এদের এ স্বভাব প্রকৃতি অন্তর্নিবিষ্ট (ইন-বিল্ট)। যত চেষ্টাই করা হোক, এদেরকে ভালো পথে আনা যায় না। শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়া ভালো। সমাজে এই শ্রেণি ছাড়া সহজ-সরল, ভালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। সমাজের উন্নত চিন্তার অধিকারী, দানশীল, মানবহিতৈষী, উদার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করতে হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলরদের মূলনীতি:

শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলররা নিম্নবর্ণিত মূলনীতি পালনে সব সময় তৎপর থাকবেন:

১. প্রত্যেক কাউন্সিলর স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবিচল। সমাজের প্রতিটা কাজ সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেন।

২. প্রত্যেক কাউন্সিলর দেশের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। জীবের প্রতি সদয়।

৩. প্রত্যেক কাউন্সিলর সত্যবাদী ও বিনয়ী। চিন্তা ও কাজে নির্মল। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন এবং বয়োকনিষ্ঠদের স্নেহ করেন।

৪. প্রত্যেক কাউন্সিলর জ্ঞানান্বেষী। জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বই নিয়মিত পড়েন এবং অর্জিত জ্ঞান নিজের ও সমাজের কাজে লাগান।

৫. মানবকল্যাণ ও সমাজসেবার প্রতিটি কাজ আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পাদন করেন।

৬. প্রত্যেক কাউন্সিলর আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। সমাজের প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজ সদস্যের সামাজিক দায়িত্বের অংশ বলে গণ্য করেন।

৭. প্রত্যেক কাউন্সিলর ন্যায় কাজের আদেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করবেন। সাধ্যমতো নিজ অর্থ-সম্পদ অভাবী, দুঃস্থ-অসহায়কে দান করেন।

প্রথম কমিটি গঠনের পর কমিটি শপথ গ্রহণের জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা কমপক্ষে সমপর্যায়ের কোনো ম্যাজিস্ট্রেট/বিচার বিভাগের বিচারক/কলেজের অধ্যক্ষ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির প্রত্যেককে যৌথভাবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

শপথবাক্য: আমি আমার ধর্মগ্রন্থের ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে শপথ করে বলছি যে, আমি আমার কর্ম ও চিন্তা দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের মঙ্গলের জন্য ও শিক্ষা-সেবা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাব। দেশপ্রেম রক্ষা করবো। সব সময় নিজেকে অহিংস রাখবো। ‘শিক্ষা-সেবা ফোরাম’-এর আদর্শ সমুন্নত রাখবো। আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তা আমার সহায় হোন।

শিক্ষা-সেবা সমাজের শিক্ষা ও সেবামূলক কাজ: শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলররা সেই সমাজের আওতাধীন প্রত্যেকটা পরিবারের প্রধানকে আলাদাভাবে বা গ্রুপে-গ্রুপে ভাগ করে সম্মিলিতভাবে সকলকে শিক্ষার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলবেন। শিক্ষায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আনতে বলবেন। সফট স্কিলস ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন। ছেলেমেয়েরা নামমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায় এবং পরে যে কোনো সময় ঝরে যায়– এরকম যেন না হয় সে-কথা বলবেন এবং বিষয়টি ভালোভাবে তদারকি করবেন। ছেলেমেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন। অভিভাবকমহলকে ছেলেমেয়েদের প্রতি সুশিক্ষার জন্য সতর্ক হতে বলবেন। ছেলেমেয়েদের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রেখে আন্তরিকতা ও স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবকমহলের– সে কথা বুঝিয়ে বলবেন। স্কুল লেখাপড়া ও

শেখার জায়গা, বাড়িতে টিউটর রেখে নয়– তা অভিভাবকদেরকে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটা অভিভাবক স্কুলের শিক্ষকদের কাছে গিয়ে শিক্ষকদেরকে সম্মানের সাথে যেন বলেন যে, স্কুলেই শিক্ষার কাজ যথাসম্ভব শেষ করে দিতে হবে, বাড়িতে কিছু বাড়ির কাজ দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় অমনোযোগী হলে শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের ডাকবেন এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতা চাইবেন। 'ফুল-টাইম স্কুলিং' যাতে চালু করা যায় সে চেষ্টা করবেন। প্রাইভেট কোচিং যেন দিনে দিনে বন্ধ হয়ে যায়, অভিভাবকমহলকে সেদিকে লক্ষ রাখতে বলবেন। প্রাইভেট কোচিংয়ের জন্য অভিভাবককে আতিরিক্ত টাকা পকেট থেকে গুনতে হয়, যা স্কুলেই শিক্ষকদের শেখানোর দায়িত্ব– তা বোঝাতে হবে। কাউন্সিলররা প্রত্যেক অভিভাবককে শিক্ষা-সচেতন করে তুলবেন। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখলে তার পরিবারের উন্নতি হবে, এটা বোঝাবেন। এ বিষয়ে কোনো অভিভাবকের সাথে কোনো তর্ক বা বিবাদে জড়াবেন না। মূল কথা হলো– জনসাধারণের টাকাতেই শিক্ষকেরা জনসাধারণের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সেবা দাতা। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক শিক্ষা-সেবার কাস্টমার। কাস্টমার তার শিক্ষা-সেবা শিক্ষাদাতার কাছ থেকে বুঝে নেবেন। শিক্ষক বেতন নেওয়ার পরও দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আলাদা কোচিং ব্যবসা ফাঁদবেন– এটা নৈতিকতার বিচারে মেনে নেয়া যায় না। তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে শিক্ষাপ্রশাসনের মাধ্যমে শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধ করা ও দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার কথা বার বার বললেও বাস্তবে কোনো সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয় না। সরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কাউন্সিলররা গেলে অধিকাংশ শিক্ষক তাদের পরামর্শ আমলে না-ও নিতে পারেন। শিক্ষকদের কাজের জবাবদিহিতা ছাড়াই এবং ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর জন্য বেশি সময় না দিয়েই বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য কাউন্সিলরদের কথা অনেক শিক্ষকই বাড়তি ঝামেলা হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ফলে যত ভালো কথাই হোক, পরিবর্তনের কথা বললেই সেগুলোকে সহজে মেনে নিতে চাইবে না– এটাই বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে কাউন্সিলররা অভিভাবকমহলকে ব্যবহার করতে পারেন। অভিভাবকমহল সতর্ক-সচেতন হলে অভিভাবক-শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা-সেবা পাবার বৈধ অধিকার সম্মানের সাথে আদায় করে নিতে পারবেন। এতেও শিক্ষক ও অভিভাবক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ সহাবস্থান বজায় থাকবে। আগলটা একবার ভাঙতে পারলেই কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণের তুলনায় অভিভাবকদেরকে সচেতন করে শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ সহজ ও টেকসই।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে কয়েকজনের সমন্বয়ে ‘উইজডম গ্রুপ’ নির্বাচন করতে পারে। ‘উইজডম গ্রুপ’ স্কুল-মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতায় অন্তত প্রতি সপ্তাহে একদিন ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞান, সামাজিক নীতিকথা, সফট স্কিলস সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে শেখাতে পারে। বাস্তবতা বিবেচনায় বলতে হয়, ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ মূলত কয়েক বছরের মধ্যে স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে সুশিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা জাতি হিসেবে ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ অবনতি রোধ করতে হবে এবং শিক্ষা ও সেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। এ গুরুদায়িত্ব ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’কেই পালন করতে হবে।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’-এর কাউন্সিলররা তাদের আওতাভুক্ত স্কুল-মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার মান উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে পারেন। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে পারেন। বুঝতে হবে, বর্তমান সমাজে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক মজবুত না হলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হবে। তাদের আওতার মধ্যে হাইস্কুল থাকলে সেখানেও যাবেন। শিক্ষকদের বলবেন, শিক্ষাদান যেন যেভাবেই হোক ছাত্রছাত্রীদের মনে সুচিন্তা ও সুস্থ ভাবের উদ্রেক করে। যত তাড়াতাড়ি হোক ভাষাটা ভালোভাবে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারতে হবে। আমি শুদ্ধ ভাষার কথা বলছি। বাংলা হোক আর ইংরেজিই হোক অবস্থা খুবই খারাপ। চতুর্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রতি সপ্তায় তিন দিন, প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে নৈতিকতা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, আর্ত-মানবতার সেবা, সততার ওপর আলাদাভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের অনুরোধ করবেন। এছাড়া শিক্ষকরা এদেরকে জীবনমুখী শিক্ষা যেমন– টয়লেট ব্যবহার, থুথু ফেলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষা, নেশার পরিণতি, বড়দের সম্মান করা, সামাজিক লৌকিকতা, নম্রতা-ভদ্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, সময়ের মূল্য দেওয়া, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার, সচ্চরিত্র গঠন, শিক্ষিত পরিবেশ গঠন প্রভৃতিও ব্যবহারিকভাবে ক্লাসে শেখাবেন। ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ কর্তৃক প্রচারিত অনুগামী শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নীতিমালা শিক্ষকদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে তাদের দায়িত্বের কথা বলতে পারেন। সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা তুলে ধরতে পারেন। তাদেরকে সমাজসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। প্রয়োজনে শিক্ষার উন্নয়নে থানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তার সাহায্য-সহযোগিতা নিতে পারেন।

বর্তমান অবস্থায় একজন শিক্ষকের পক্ষে মোট বেতনে (মূল বেতন ও বাড়িভাড়াসহ অন্যান্য ভাতা) গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে মূল্যস্তর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য বাড়তি ভাতার ব্যবস্থা করতে পারে। বিভিন্ন বেসরকারি বা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্কুল-মাদ্রাসায় পড়ার মানকে উন্নত করে, যাতে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে গিয়ে টিউটরের কাছে টাকা ব্যয় করে আলাদা পড়তে না হয়, অভিভাবকমহলের কাছ থেকে বর্তমান বেতনের তুলনায় কিছু বাড়তি বেতন নিয়ে সে-টাকা শিক্ষকদের বেতনের সাথে ভাতা হিসেবে যোগ করে দিতে পারে। এতে শিক্ষকরা উপকৃত হন। তবে কোনো সুযোগ-সুবিধা একমুখী হওয়া উচিত নয়। শিক্ষকদেরও ছাত্রছাত্রীদের ভালোর জন্য বৈধ ভালো কিছু করতে হবে। স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুলে বসিয়েই ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব শেখাতে হবে। আবার সংশ্লিষ্ট পক্ষও শিক্ষকদের আর্থিক বিষয়টা বিবেচনায় আনবেন। কিন্তু শিক্ষকদের আয়-রোজগার কমের অজুহাতে টিউশনি ও কোচিংয়ের রমরমা ব্যবসাকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সমাজ থেকে এ অপচর্চা উচ্ছেদ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিক সময় স্কুলে ধরে রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত পাঠ দেওয়া ও সাথে সাথে ক্লাস-মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে দুইবার টিফিনের ব্যবস্থা করা যায়। স্কুল-মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা করার ব্যবস্থা করা যায়। স্কুলে লেখাপড়া ভালোমতো ও নিয়মমতো হলে, অভিভাবকমহল সচেতন হলে টিউশনি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকদের স্কুল-মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন 'শেখাতে যাচ্ছি'। ছাত্রছাত্রীদের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে 'শিখতে যাচ্ছি'। এসব কথার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রভাব অবশ্যই আছে। অভিভাবকমহল ছেলেমেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আজ কী কী শিখেছো, বলো?' কাউন্সিলররা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের নোট ও গাইড বই স্কুলে পড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন ও পড়ানোর ধরন এমন হবে যে, ছাত্রছাত্রীদের যেন নোট ও গাইড বই পড়ার দরকার না হয়। বর্তমানে ড্রাগ-এবিউজ সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন। আমরা জানি, একটা সমাজে সুশিক্ষা ক্রমশ বিস্তার লাভ করলে কুশিক্ষাও ক্রমশ দূরে সরে পালায়। সমাজে, অফিস-আদালতে সুশিক্ষিত লোকের পদচারণা বাড়লে দুর্নীতি কমবে, সুনীতি বাড়বে। সুস্থ-চিন্তাশীল সুশিক্ষিত লোক ক্রমশ

জনপ্রতিনিধি হতে এগিয়ে আসবেন। নইলে কোনো একক ব্যক্তির কথায় সমাজ, অফিস-আদালত দুর্নীতিমুক্ত, অপব্যবস্থাপনামুক্ত কোনোদিনই হবে না। যতই টুপি-পাগড়ি পরে মোনাজাত করিনে কেন, নিজেকে সহি মুসলমান বলে দাবি করিনে কেন, একটু চোখ বুজে দেখলেই উপলব্ধিতে আসবে– দেশব্যাপী দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানিতে এ দেশের মানুষের পরকালের মুক্তির পথও ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এ দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সময়ের প্রয়োজনে দেশরক্ষার স্বার্থে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

কাউন্সিলররা আওতাভুক্ত প্রতিটি মাদ্রাসাতে যাবেন। মাদ্রাসাশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ দেবেন। মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে লেখাপড়া শিখে তার পরিবারে ও সমাজে অবদান রাখতে পারে সেজন্য অনুরোধ করবেন। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী শিক্ষা নিয়ে কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে কথা বুঝিয়ে বলবেন। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন অফিসে চাকরিতে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশবাসীকে ভালো সেবা দিতে পারবে এবং এর বিনিময়ে হালাল রুজি রোজগার করতে পারবে। এছাড়া জনসেবার জন্য পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হবে– এসব কথা বুঝিয়ে বলবেন। দেশবাসীও অফিসের ভালো সেবা পাবে, ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে, ভোগান্তি দূর হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা করলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। উপার্জিত টাকা থেকে গরিব-অভাবীদের দান-খয়রাত করে পরকালের মুক্তি অর্জন করতে পারবে। সাদাকায়ে জারিয়াও করতে পারবে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে পারবে। ব্যবসাতে যদি ধার্মিক, চরিত্রবান, সৎ লোক চলে আসে, সাধারণ মানুষ যার-পর-নাই উপকৃত হবে। ওজনে কম নিতে হবে না, ভেজাল জিনিস খেতে হবে না, ব্যবসায়ীদের থেকে প্রতারিত হতে হবে না। কালোবাজারি, মজুতদারি, সিন্ডিকেটের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। কর্মক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পেশায় যত সৎ, সুশিক্ষিত ও ধার্মিক লোক এসে যোগ দেবে, সমাজে তত শান্তি ফিরে আসবে। ঝামেলা, ফ্যাসাদ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি তত দূরে সরে পালাবে। –এসব কথা কাউন্সিলররা মাদ্রাসার শিক্ষকদের বুঝিয়ে বলবেন। কথায় আছে, 'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে।' ভালো উন্নয়নমূলক কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সেটা বুঝবে এবং সে মতো কাজ করবে। আরো বলবেন, ধর্মকে পেশা বানানো ঠিক না। প্রতিটা মুসলমানেরই ধর্মের পাশাপাশি একটা কর্মের পেশা থাকা জরুরি। প্রত্যেকে ভদ্রভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন। কারো সাথে তর্কে জড়াবেন না।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এ দেশের স্কুল-কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাস যথেষ্ট উন্নত। বার বার সিলেবাস পরিবর্তন আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। সময়ে সময়ে সিলেবাসের পরিমার্জন, পরিবর্ধন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ দেশে সিলেবাস প্রয়োগ বা কাজে পরিণত করাতে সমস্যা। এজন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রত্যেক শ্রেণিতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন, বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্রের ধরন, ক্লাসে পড়ানোর ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার। এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষা-সেবা সমাজের কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। বিষয়গুলো নিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার পর যথাসময়ে শিক্ষা-সেবা সমাজকে অবহিত করবে। সে-মতো শিক্ষা-সেবা সমাজ কাজ করবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের সকল কাউন্সিলরের একটা বড় দায়িত্ব হলো সমাজের নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলোকে শিক্ষার আলো দেওয়া। স্কুল ও শিক্ষকরাও সমাজের অংশ। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছাড়াও বিদ্যমান সমাজ ও সমাজব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নেয়। সমাজে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অবিচার বিরাজমান থাকলে সেগুলোই ছাত্রছাত্রীরা বেশি শেখে। আমাদের দেশে শিক্ষামানের অবনতির মূল কারণ এখানে। এটা একটা দুষ্টচক্র। তাই সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোকে সুশিক্ষার ছায়াতলে আনতে হবে। স্কুল-কলেজে শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষা-সেবা সমাজের অফিস প্রাঙ্গণে অথবা কোনো স্কুলে অথবা কোনো মসজিদ-মাদ্রাসার আঙিনায় মানুষগুলোকে দলে দলে ভাগ করে অবসর সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটা মানুষকে অন্তত দৈনিক পত্রিকা ভালোভাবে পড়তে পারা ও বোঝায় সক্ষম হতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষকে ভালো গুণ অর্জনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রতিটা গ্রুপে পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন করে ভাগ করে সমাজের প্রতিটা পরিবারকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রতি দুই বা আড়াই মাস পর পর প্রতিটা গ্রুপের প্রশিক্ষণের পালা আসবে। প্রতিজনকে অন্তত দশটা প্রশিক্ষণ সেশনে অংশ নিতে হবে। সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয় হবে মানুষের সুস্থ মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষাসহায়ক বিষয় যেমন– স্বাস্থ্যশিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা, সততা, পরোপকারের গুরুত্ব, নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, সামাজিক শিক্ষার উপকারিতা, প্রতিহিংসার পরিণতি, প্রতিটা মানুষের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব, সন্তানদের সুশিক্ষিত করার সুবিধা, ধর্মপালনের ভালো দিক, বাপ-মা ও নারীর মর্যাদা, সফট স্কিলস ইত্যাদি ইত্যাদি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিকাংশ মানুষকে ভালো পথে আনা সম্ভব– এ চিন্তা মাথায় দানা বাঁধতে হবে।

আবার একটা ঘটনা বলি। একটা সচ্ছল ব্যবসায়ী পরিবার। গ্রামের পাশে একটা বাজারে বসবাস। গ্রামে চাষবাস আছে। পরিবারের কর্তা সত্তরের দশকের আইএ পাস। গৃহিণীও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। আমি অনেক বছর ঐ বাড়িতে যাইনি। একদিন যেতে হলো। ছেলেমেয়েগুলো এতদিনে বড় হয়ে গেছে। বসার ঘরে বসতেই শ্বাশুড়ি বড় বৌমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। এইচএসসি পাস। মেয়েটা আমাকে সালাম দিলো। কোলে আড়াই-তিন বছরের ছেলে। বসার ঘরে বসে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর সাথে গল্প করছি। বৌমা একটা রাবারের স্যান্ডেল পরে পটাশ পটাশ শব্দ করে বাটি হাতে ছেলেটাকে পিছ পিছ খাইয়ে বেড়াচ্ছে। খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না বলে টিভি চালিয়ে দিলো। রিমোট দিয়ে এদিক-ওদিক চ্যানেল পরিবর্তন করছে। বাংলা থেকে হিন্দি, হিন্দি থেকে বাংলা চ্যানেল টিপছে। বৌমা বার বার টিভির পর্দায় চোখ রাখছে কিন্তু ছেলেটার রোগা শরীর ও পেটের দিকে তাকাচ্ছে না। শরীরে রক্তশূন্যতা, পেটটা মোটা। খিদে লাগে না, তাই খেতে চায় না। বলছে, ‘তুই খাইতে চাইতেছিস নে ক্যান? আমি তোরে খাওয়াইতে পারতেছি না।’ সে ওখানকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললে কিংবা বইতে পড়া চলিত ভাষায় কথা বললে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু না-ঝোল না-চচ্চড়ি গোছের আধাখেঁচড়া ‘ভদ্দরলোকি’ ভাষার ব্যবহার আমার কানে বাজতে লাগলো। মনে হলো ছেলেটার পেটে কৃমি হয়েছে। তার মা-দাদির এ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই।

বাড়ির সবারই সাজগোজ পরিপাটি। বৌমা কোন প্রসাধনীর কত দাম ভালোমতো জানে। পটাশ পটাশ স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে পারে। টিভিতে হিন্দি ছবি বসে বসে গিলতে পারে। এর নাম শিক্ষা না। বাড়ির প্রতিটা মানুষেরই স্বাস্থ্যশিক্ষার অভাব মনে হলো। বৌমা যদি তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভেজাল সোয়াবিনের তেলে ডোবানো খাবার, অত্যধিক ভাজা-পোড়া খাবার বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিতে জানতো। ছেলেটার দিকে স্বাস্থ্যসচেতন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কৃমি হয়েছে অনুমান করে যথাসময়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে পারতো। সময়মতো ওষুধ নিজে খেতো বা বাচ্চাটাকে খাওয়াতো, বুঝতাম, তার শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। টাকা আছে। বাড়িসুদ্ধ শিক্ষা নেই। স্বাস্থ্যশিক্ষা তো নেই-ই।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ মাঝে-মধ্যেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের প্রতিটা লোককে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবা দেবে। জানি প্রতিটা উপজেলায় স্বাস্থ্য বিভাগ আছে। তাদের কাজ কি তাও জানি। তাদের কাজের ধরন-ধারণ ও কাজের গতিও জানি। তাদের তালে তালে স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা দিতে গেলে হয়তো আরো একশ বছর লেগে যাবে। তাদেরকে বিদায়

করার আন্দোলন করার দরকার নেই। নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কাজগুলোকে বেগবান করতে হবে। নিজেদের কাজ নিজেরা করতে হবে। তারা সাথে থাকতে চাইলে সাথে নিতে হবে। তাদের ওপর কোনো কাজ ছেড়ে দিলে হবে না। সমাজ শিক্ষিত না হলে তারাও শিক্ষিত হবে না।

সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য সমাজে যদি কোনো যোগ্য লোক থাকে, তাকে নেওয়া যেতে পারে। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আনা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে আনা যেতে পারে। এ বিষয়ে পারিশ্রমিকের বিধান চালু না করাই ভালো। সম্মানিত প্রশিক্ষককে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ দেওয়াটাও সম্মানিত প্রশিক্ষকের একটা সমাজকর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব। কাউন্সিলররা প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করতে পারেন নামাজের দিন খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, একজন মুসলমানের আরেকজন মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, ইসলামি অর্থনীতি, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য কাউন্সিলর হিসেবে সাথে নিতে পারেন।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে এর আগেই তৃতীয় অধ্যায়ে ইচ্ছে করেই একটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি– শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলরদের বিষয়টা ভালোভাবে বোধগম্য করার জন্য। প্রয়োজনে তারা বইপত্র পড়ে ও ইন্টারনেট ঘেটে এ বিষয়ে আরো অনেক তথ্য বের করে শিখতে পারেন। তাদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া। সেখানে কর্মরত মৌলভি-মাওলানাদের সাথে সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। মৌলভি-মাওলানারা না-বুঝে তাদের অজান্তেই অকপটে কোমলমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সযত্নে বেকার, অর্ধবেকার, ছদ্মবেকার, অকর্মণ্য, সৃষ্টি ও দুনিয়ার কাজে অযোগ্য করে খোদাভক্ত মুসলমান তৈরি করছে। এর জন্য পরকালে মৌলভি-মাওলানাদেরও কৈফিয়ত দিতে হবে। এসব কথা কাউন্সিলররা বুঝিয়ে বলবেন। কাউন্সিলরদের কাজ হচ্ছে, স্থানীয় সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও

জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা ও বিজ্ঞানমুখী-ব্যবস্যামুখী শিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে শিক্ষকদের বলা। মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষা ও বিজ্ঞান-ব্যবসামুখী শিক্ষার প্রচার চালানো। এতে তাদের ও কোমলমতি অবুঝ শিক্ষার্থীদের ইহকাল ও পরকালের লাভ, এটা বোঝানো। আমরা অভাবে পড়ে, সামাজিক দুরাচারদের খপ্পরে পড়ে, দুরবগ্রহ মানসিক ব্যাধিতে ভুগে, পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতে জড়িয়ে, প্রতিহিংসায় মেতে না-বুঝে ইহকাল ও পরকালকে নিঃশেষ করে ফেলছি, যারপরনাই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি– এসব বুঝিয়ে বলতে হবে।

এক সময়ে গ্রামের স্কুল থেকে লেখাপড়া করে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী বোর্ডের পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। অফিস-আদালতের বড় বড় পদে গ্রাম থেকে এসে স্থান করে নিত। সে দিন আজ কোথায় গেল! অর্থাৎ বর্তমানে গ্রামের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ভালোমতো হচ্ছে না, সামাজিক পরিবেশও খারাপ হয়ে গেছে। তাই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেধার বিকাশ না ঘটাতে পেরে অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের ভাবনার উদ্রেক আদৌ করাচ্ছে না। বিষয়গুলোকে কাউন্সিলররা সমাজে ভালোভাবে প্রচার করবেন। আমাদের বাস্তব দশা ও ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেবেন। ভালো কথা বলা, ভুলগুলোকে ভালোভাবে ধরিয়ে দেবার লোক বর্তমান সমাজে নেই বললেই চলে। কাউন্সিলরদের এ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ তাদের অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ও নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্যরা বসার জন্য সমাজের আওতাধীন কোনো একটা সুবিধাজনক জায়গায় এক বা একাধিক অফিস রুম তৈরি করে নিতে পারেন। অফিস রুম তৈরি করাতে কারো কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় বা কষ্টের কারণ হয়, এমন জায়গায় অফিস তৈরি না করাই ভালো। যে কোনো পর্যায়ের যে কোনো কাজে শিক্ষা-সেবা সমাজ সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা, তর্ক, অবিচার ও অনৈতিকতার উর্ধ্বে থাকবে। কারো কোনো সম্পদ ব্যবহার করলে তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাকে ধন্যবাদ জানাবে। শিক্ষা, ত্যাগ, সততা, মানবতা, সমাজসেবা ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ পাথেয়। শিক্ষা-সেবা সমাজ এর অফিসের পাশে কিংবা দৃষ্টিপথের কোথাও ব্যানার আকারে লিখে রাখবে, ‘মানুষের জন্য মানুষ’; কিংবা ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’; কিংবা ‘সৃষ্টির সেবাই উৎকৃষ্ট ইবাদত’; কিংবা এমনই অর্থপূর্ণ আরো অনেক কিছু।

শিক্ষা-সেবা সমাজকে নিজ এলাকায় একটি শিক্ষা-সেবা ক্লিনিক ও একটা কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করতে হবে। কাউন্সিলররা ঐ ক্লিনিককে অবলম্বন করে সমাজে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সার্বিক বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য একজন টেকনিশিয়ানকে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লিনিকের জন্য নিয়োগ দেওয়া যায়। সে আওতাধীন এলাকার প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে মাসব্যাপী রক্তের প্রেসার পরিমাপ করবে, প্রয়োজন হলে রক্তে সুগার পরীক্ষা করবে। সে মিশুক প্রকৃতির হবে। স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে মুখটা সবার জন্য খোলা রাখবে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলবে। নামমাত্র নির্ধারিত ফি নেবে। এভাবে আদায়কৃত অর্থ ক্লিনিকের ফান্ডে তারিখ ও দাতার নাম অনুযায়ী জমবে। এখান থেকে মাস গেলে তার বেতনের সংস্থান হবে। অতিরিক্ত টাকা ক্যাশিয়ারের তত্ত্বাবধানে ফান্ডে থাকবে। টেকনিশিয়ান এলাকার মানুষের নাম, বয়স ইত্যাদি কম্পিউটারের ডাটা-শিটে সংরক্ষণ করবে। প্রতিদিন কাজ শেষে ফিরে প্রেসারের মাপ ও সুগার লেভেল কম্পিউটারে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে পোস্টিং দেবে। মানুষের স্বাস্থ্য-ইতিবৃত্ত জনে জনে রক্ষা করবে। এই রেকর্ড পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য কিংবা অন্য কোনো বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কাজে লাগবে। কাউন্সিলররা উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যিনি বা যারা সপ্তাহে একেক দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফিতে বা নামমাত্র ফিতে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যারপরনাই উপকৃত হবে।

সমাজ থেকে বই পড়ার অভ্যাস উঠে গেছে। এতেও বোঝা যায় মানুষ খারাপ কোনো অভ্যাসের দিকে ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে। সামাজিক পরিবেশকে ভালো পথে আনতে গেলে বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। অনেকেই বলবে, 'সময় নেই'। আসলে বিষয়টা তা নয়। বই পড়ার অভ্যাস নেই, রেওয়াজ নেই এটাই সত্য। কমিউনিটি পাঠাগারে সকল শ্রেণির মানুষের উপযোগী ধর্মের বইসহ সব রকমের বই থাকবে। সাধারণ মানুষ পাঠাগারে এসে অবসর সময়ে বই পড়বে, দৈনিক পত্রিকা পড়বে। পাঠাগারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আলাদাভাবে প্রতি বছর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। এতে কয়েক বছরের ব্যবধানে সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার স্পৃহার বিস্তার ঘটবে। কাউন্সিলররা নিজ উদ্যোগে পাঠাগারের বই সংগ্রহ করতে পারেন। এর পাশাপাশি 'শিক্ষা-সেবা পরিষদ' জাতীয় পর্যায়ে বই সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেবে এবং প্রতিটি কমিউনিটি পাঠাগারে বই সরবরাহ করবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ তার এলাকার অবস্থা বিবেচনা করে পাশাপাশি চার/পাঁচটি সমাজের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় একটি টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবে। সেখানে অত্র এলাকার সকল শ্রেণির মানুষের ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করবে। সমাজের মানুষকে টেকনিক্যাল শিক্ষায় আকৃষ্ট করবে। কম ফিতে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেবে। এ বিষয়ে তারা উপজেলা/জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং তাদের সহযোগিতা নেবে। শিক্ষা-সেবা সমাজের তত্ত্বাবধানে আদায়কৃত ফি ট্রেইনার পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন।

বাস্তব কথা এই যে, প্রতিটা উপজেলা/জেলা পর্যায়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য অনেক অনেক বিভাগ, জনশক্তি, উপকরণ ও আর্থিক বরাদ্দ আছে। আছে কাগুজে পরিকল্পনা, তহবিলের ব্যাপক সিস্টেম লস, দলবাজি, দীর্ঘসূত্রিতা ও দায়িত্বে উদাসীনতা। নেই আন্তরিক প্রচেষ্টা, পরিকল্পনার বাস্তব ফলপ্রসূ প্রয়োগ, যথার্থতা (প্রপ্রাইটি) মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা। শিক্ষা-সেবা সমাজ স্ব-উদ্যোগে দ্রুত গতিতে নিজে কাজ করবে, নিজস্ব পরিকল্পনা নিজেরাই বাস্তবায়ন করবে এবং যতটুকু পারা যায় উপজেলা/জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিসের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। কোনোভাবেই তাদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, একটা নষ্ট-হয়ে-যাওয়া সমাজ, সমাজের অশিক্ষিত-কুশিক্ষিত, লুটেরা রাজনৈতিক শিক্ষায় ট্রেইনিংপ্রাপ্ত মানুষজন নিয়ে ভালো কিছু করা প্রথমেই অতটা সহজ নয়। অশিক্ষিতের শতেক দোষ। সমাজের কোনো একটা সুশিক্ষিত অংশ যতই ভালো কিছু করুক না কেন শতেক দোষ আবিষ্কার করে, পাল্টা প্রতিপক্ষ তৈরি করে, মুখে কালিমা লেপে সমাজচ্যুত করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সততা ও জ্ঞানের বাতি হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জয় সুনিশ্চিত। বেশ কয়েক বছর অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে তারপর একটা সুস্থ পরিবেশ আসবে। এ কষ্টটুকু ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’কেই ভোগ করতে হবে। ধৈর্য ধরে অসুস্থ পরিবেশের সাথে মানসিক যুদ্ধ করে যেতে হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ তার এলাকার প্রতিটা পরিবারকে স্ব-উদ্যোগে তালিকাভুক্ত করবে। ডেমোগ্রাফিক তথ্য রাখবে। কে গরিব-নিঃস্ব, কার আয়-রোজগারের কেউ নেই, কে কেমন অসুস্থ খোঁজ নেবে। কার আর্থিক অবলম্বন নেই দেখবে। কার পেশা পরিচালনায় কর্ম-হাতিয়ার (টুলস) নেই সেগুলো খুঁজে বের করবে। যেমন– একজন কর্মঠ মহিলা, দর্জির কাজ জানে অথচ তার সেলাই মেশিন নেই বা ছিল– এখন নষ্ট হয়ে গেছে; একজন রিক্সাভ্যান চালক, তার উপার্জনের পথ রিক্সাভ্যান, রিক্সাভ্যানটা পুরোনো হয়ে গেছে; একজন গরিব-নিঃস্ব মহিলা– একটা বকনা

বাছুর পালন তার উপার্জনের পথ করে দিতে পারে। এসব শ্রেণির লোকদের তালিকা তৈরি করে ছয় মাস পর পর পর্যায়ক্রমে ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য নগদ সাহায্য এবং সেলাই মেশিন, রিক্সাভ্যান, বকনা বাছুর, ছাগল ইত্যাদি কিনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে শিক্ষা-সেবা সমাজ একটা সভার মাধ্যমে দিতে পারে। এতে এই শ্রেণির লোক, যারা সামাজিক শোষণের প্রত্যক্ষ ও নির্মম শিকার, টিকে থাকার অবলম্বন পাবে। আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ বিনা সুদে আর্থিক সহায়তা নিয়ে অন্য কোথাও সুদে টাকা খাটাচ্ছে কিনা। শিক্ষা-সেবা সমাজ সাধারণ মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাকে উপার্জনে সক্ষম করে তুলবে। এ বিষয়ে লক্ষ রাখবে যে, আর্থিক সহায়তা গ্রহণকারী যেন প্রাপ্ত সহায়তার অপব্যবহার না করে। সেখান থেকে স্বল্প কিস্তিতে আসল টাকা ফেরত নিয়ে আবার অন্য কাউকে আর্থিক সহায়তা করা যায়।

এ বিষয়ে কিছু তথ্য যোগ করি। আমার দু জন সহকর্মী সমাজের গরিব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়ান। তারা তাদের এলাকায় কখনো বকনা বাছুর, কখনো রিক্সাভ্যান, কখনো সেলাই মেশিন কিনে দেন। গরু দাতার শর্ত এই যে, গরুর প্রথম বাছুর জন্ম নিলে তাদের মাধ্যমে সমপর্যায়ের অন্য কাউকে দান করে দেবে। সেলাই মেশিন ও ভ্যানগ্রহীতাদের শর্ত হলো, তারা প্রতি মাসে অতি সহজ কিস্তিতে আসল টাকার পরিমাণ পরিশোধ করতে থাকবে। তারা আদায়কৃত অর্থের সাথে আরো কিছু টাকা দিয়ে অন্যদের আবার কোনো কর্ম-টুল কিনে দেয়। কয়েক মাস পরে যদি দেখা যায় যে, গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছলতার দিকে যাচ্ছে না, তাহলে তাকে কিস্তির টাকা দেওয়া থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। এখানে সেলাই মেশিন ও রিক্সা ভ্যানের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কর্মের (একটিভিটি) আওতা অনেক বাড়ানো যায়। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র আর্থিক সাহায্য (কিন্তু পণ্যে) মানুষকে সমাজে টিকে থাকতে ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ে দারুণ সহায়তা করে।

এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল উদাহরণ দেওয়া যায়। শিক্ষা-সেবা সমাজের আওতায় মোট তিন হাজারটি পরিবারের তালিকা করা হলো। এর মধ্যে দুইশটি পরিবারের আর্থিক সহায়তা দেওয়া দরকার বলে তালিকা করা হলো। বছরে দু বার করে প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মের (একটিভিটির) জন্য ত্রিশ জনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হলো। পরিবার প্রতি তিরিশ হাজার টাকার মূলধন (পণ্য) সহায়তা দিলেও প্রথম বছরে নয় লক্ষ টাকার মূলধন শিক্ষা-সেবা সমাজের হাতে থাকতে হবে। বাস্তবতার বিবেচনায় এ পরিমাণ কমবেশি করা যায়। এর পরের বছর থেকে

কখনোই এর বেশি মূলধন বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না। শুধু আদায় করা এবং প্রদান করার কারণে ধরে নেয়া যায় চার লক্ষ টাকা ঘাটতি মূলধনের সংস্থান করার প্রয়োজন হবে। প্রতি বছর এভাবে ত্রিশটি পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করতে পারলে অল্প সময়ে তালিকার সবাইকে সহায়তার আওতায় আনা সম্ভব। এভাবে সহায়তা চক্রাকারে ঘোরানো যায়। অগ্রাধিকার ভিত্তি নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষা-সেবা সমাজের হাতে পরবর্তী কালে মূলধনের পরিমাণ বাড়লে সহায়তার আওতাও বাড়ানো যায়।

এছাড়া সরকারি বাজেট-ব্যয়ের একটা বড় অংশ প্রতিটা সরকার সমাজকল্যাণের জন্য প্রতি বছর বরাদ্দ করে এবং খরচ করে। এর বেশির ভাগ টাকাই মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে চলে যায়, অথবা রাজনৈতিক কাজে ব্যয় হয়। যখন যে সরকার আসে, ইচ্ছে করেই এটা করে। চার ছিটিয়ে উচ্ছিষ্টভোগীদের হাতে রাখে। উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করে। রাজনীতির খাদক-গোষ্ঠীকে বিভিন্ন অজুহাতে ধরে রাখটাই মূল উদ্দেশ্য। মোট বাজেট-ব্যয়ের শতকরা পাঁচ ভাগও যদি সরকার বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতের নাম উল্লেখ করে ব্যষ্টিক উন্নয়নের জন্য ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’-এর মাধ্যমে সরাসরি প্রান্তিক নিম্নবিত্ত ও অভাবী মানুষের জন্য খরচ করে সেক্ষেত্রে সরকারি অর্থের অপচয় আদৌ হবে না, সিস্টেম লসও হবে না এবং যথাযোগ্য ব্যক্তিরা সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। অর্থনৈতিক সামর্থ্য অর্জন করবে। সমাজের প্রকৃত আর্থিক উন্নয়ন হবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ যদি সুন্দরভাবে উদ্দেশ্যভিত্তিক সমাজ উন্নয়নের কাজ দেখাতে পারে, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে পারে। তখন ‘শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ দেশের ব্যষ্টিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট আকারে বা সাধারণ বরাদ্দ আকারে নিয়মিত অনুদান পেতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এ সহায়তার পুরোটাই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তার কাজে ব্যয় হবে। কোনো ঋণ আকারে ব্যয় করা হবে না, তাই এর কোনো সুদের প্রশ্নই আসে না। আবার মুদ্রাস্ফীতির কথা ভেবে এ সহায়তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পণ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। সরকারি বাজেট বরাদ্দ (যদি থাকে) ব্যবহারের নির্দেশিকা ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ সময়ে সময়ে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’কে অবহিত করবে।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান।

শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল

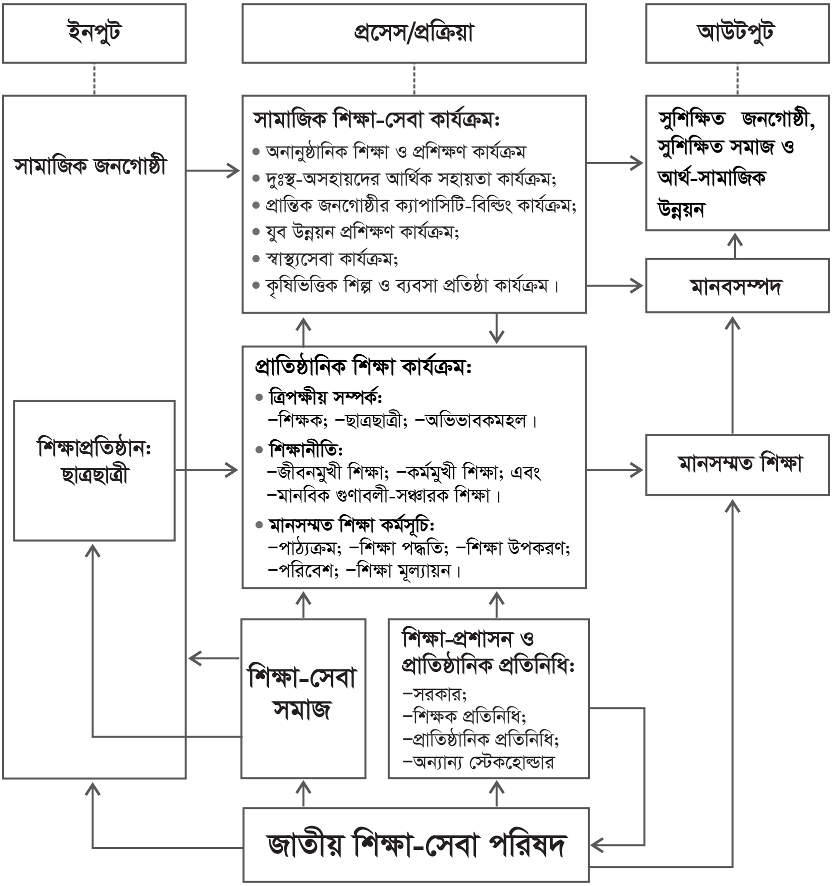
ইনপুট
প্রসেস/প্রক্রিয়া
আউটপুট
সামাজিক জনগোষ্ঠী
সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম:
• অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
• দুঃস্থ-অসহায়দের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;
• প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি-বিল্ডিং কার্যক্রম;
• যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
• স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম;
• কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম।
সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সুশিক্ষিত সমাজ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
মানবসম্পদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ছাত্রছাত্রী
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম:
• ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক:
–শিক্ষক; –ছাত্রছাত্রী; –অভিভাবকমহল।
• শিক্ষানীতি:
–জীবনমুখী শিক্ষা; –কর্মমুখী শিক্ষা; এবং
–মানবিক গুণাবলী-সঞ্চারক শিক্ষা।
• মানসম্মত শিক্ষা কর্মসূচি:
–পাঠ্যক্রম; –শিক্ষা পদ্ধতি; –শিক্ষা উপকরণ;
–পরিবেশ; –শিক্ষা মূল্যায়ন।
মানসম্মত শিক্ষা
শিক্ষা-সেবা সমাজ
শিক্ষা-প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি:
–সরকার;
–শিক্ষক প্রতিনিধি;
–প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি;
–অন্যান্য স্টেকহোল্ডার
জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ

তৃতীয় যে কাজটার কথা এর আগের অধ্যায়ে বলেছি তা হচ্ছে– সমাজের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী লোকগুলোকে বুঝিয়ে এলাকার কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে ছোট ছোট শিল্প ও সেবাধর্মী কোম্পানি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে কোম্পানি যদি একজন সৎ ও যোগ্য ব্যবস্থাপকের ওপর নির্ভর করে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজ যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে কোম্পানির পরিচালকদের পক্ষে লাভজনকভাবে কোম্পানি পরিচালনা করা অতি সহজ। এ প্রচেষ্টার সফলতা গ্রাম-বাংলার অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গ্রামে-গঞ্জের জনগোষ্ঠীকে টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা আগেই বলেছি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমশই ঐদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই দেশটা একদিন-না-একদিন শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এ বিষয়ে ‘জাতীয় শিক্ষা সেবা পরিষদ’ যথাসময়ে এ জাতীয় কোম্পানিকে সাধ্যমতো সুপরামর্শ দেবে।

কার্যত আমরা বাস্তবে দেখি, সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, দিক-নির্দেশনার এ দেশে বাস্তব প্রয়োগ খুব কম। এভাবেই যুগের পরে যুগ চলছে। বলা যায়, কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পরিকল্পনা ও নির্দেশনার অধিকাংশ পথের মধ্যে সিস্টেম লসে খেয়ে ফেলে। ফলে পরিকল্পনা ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন সামান্য হয়, কখনো আদৌ হয় না। এটা এ দেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটা বড় সমস্যা। এজন্য ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’-এর সকল পরিকল্পনা, নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়ে সরাসরি সফল বাস্তবায়নের জন্য বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের অর্থসংস্থান: শিক্ষা-সেবা সমাজ একটি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। শিক্ষার উন্নয়ন ও পরোপকারের উদ্দেশ্যে গঠিত। তাদের কাজ পরকালের কল্যাণের আশায় উৎসর্গীকৃত। তারা নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ জনসাধারণের কল্যাণে সাধ্যমতো ব্যয় করবেন। কাউন্সিলের প্রত্যেকেই দানশীল প্রকৃতির হবেন এটাই প্রত্যাশা। তারা প্রত্যেকে শিক্ষা-সেবা সমাজের ফান্ডে মাসিক হারে সাধ্যমতো চাঁদা দেবেন। চাঁদার হার সামর্থ্যানুযায়ী বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পরিমাণ হবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ কোনো ব্যাংক-ব্যালান্স তৈরির কথা ভাববে না। শিক্ষা-সেবা সমাজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে, আবার সমাজের গরিব-অভাবি মানুষের জন্য নির্ধারিত কাজে ব্যয় করবে। এটাকে সম্পদের পুনর্বণ্টন বলা যায়। কারণ সামর্থ্যবানদের অর্থ-সম্পদে গরিব-অভাবিদের অধিকার (হক) আছে– ধর্মীয় নিয়ম-নীতি তাই বলে। সামর্থ্যবানদের বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো জোর-জবরদস্তি চলবে না। এখনো সমাজের অসংখ্য ধর্মভীরু সচ্ছল মানুষ গরিব ও অসহায় মানুষের সেবায় জাকাত দিয়ে থাকে এবং সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে আল্লাহর নামে অর্থ-সম্পদ দান, সদকা ও সাহায্য করে থাকে। শিক্ষা-সেবা সমাজের কাজ হলো এসব জাকাত, সদকা, দান ও সাহায্য একজায়গায় জমা করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় ও বণ্টন করা।

শিক্ষা-সেবা সমাজ কর্তৃক তৈরিকৃত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে সমাজ নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করবে। চাঁদার পরিমাণ জনে জনে কমবেশি হতে পারে। কারো প্রতি কোনো চাঁদা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যখন

দেখবে যে, তাদের সমাজেরই দরিদ্র-অসহায়-নিঃস্ব পরিবার অনুদান আকারে টাকা পাচ্ছে, তারা মাসিক চাঁদা ও দান-সাদকা দিতে এগিয়ে আসবে।

সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শিক্ষা-সেবা সমাজ তাদেরকে বুঝিয়ে এবং কাজকে বিশ্বাসযোগ্য করে, আস্থায় এনে অনুদান সংগ্রহ করবে। এলাকার সামর্থ্যবানদের দান-খয়রাত, সাদকা, ফেতরা, জাকাত, এককালীন দান, নিয়মিত চাঁদা প্রভৃতি শিক্ষা-সেবা সমাজের অর্থের প্রধান উৎস হবে। এলাকার কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক হারে নিয়মিত চাঁদাও শিক্ষা-সেবা সমাজের ফান্ডে এসে জমা হবে। ধর্মের খাতিরে এবং পরকালে প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় গ্রাম-বাংলার মানুষ এখনো মুক্ত হাতে দান-খয়রাত করে। প্রাপ্ত অর্থ যদি স্বচ্ছতার সাথে ভালো কাজে ব্যয় করা হয় এবং সাধারণ মানুষের সামনে নিয়মিত হিসাব দেওয়া হয়, দাতা-সমাজ অর্থ দান করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এটা আশার কথা যে, এভাবে এ দেশের মাদ্রাসাগুলো যুগ যুগ ধরে টিকে আছে এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজের সাধারণ মানুষকে আস্থায় নিতে পারলে শিক্ষা-সেবা সমাজও এভাবে অর্থসংস্থান করে তাদের কর্যক্রম চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে গঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত) লভ্যাংশও শিক্ষা-সেবা সমাজের ফান্ডের উৎস হবে। অবশ্য এ লভ্যাংশ পেতে শিক্ষা-সেবা সমাজকে সক্রিয় অবস্থায় বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান শিক্ষা-সেবা সমাজ সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহার করবে।

কোনো সরকার বা দাতা প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষা-সেবা সমাজকে কোনো এককালীন অনুদান বা বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ দেয়, তাও শিক্ষা-সেবা সমাজের ফান্ডের উৎস বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুদান এলাকায় বসবাসরত তালিকাভুক্ত পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদান বা দান বাবদ সরাসরি ব্যয় করা হবে। নিজেদের নিয়মিত চাঁদার অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোনোক্রমেই শিক্ষা-সেবা সমাজ পরিচালনা বা অফিস খরচের কাজে ব্যয় করা যাবে না।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার শিক্ষা-সেবা সমাজের আয়-ব্যয়ের হিসাব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ কাউন্সিল মিটিংয়ে অবশ্যই উপস্থাপন করবে। হিসাবের প্রমাণ (ডকিউমেন্ট) রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বাৎসরিক হিসাব

তৈরি করবে। প্রতিটা লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় রাখবে। বাৎসরিক হিসাবের একটা কপি শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাছে বছর শেষ হবার দেড় মাসের মধ্যে জমা দেবে। পরিষদ প্রয়োজনে হিসাবের ইন্টারনাল অডিট করবে।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে শিক্ষা-সেবা সমাজের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলবে। সমস্ত লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে। তিন জনের মধ্যে যে-কোনো দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলররা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা-সেবা সমাজের নামে লিখিত রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা কিংবা অনুদান সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে এককভাবে কোনো টাকা সংগ্রহকে নিরুৎসাহিত করা হবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ এর কাজ ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার পরিচয় দেবে। নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের যৌথ স্বাক্ষরে লিখিত অভিযোগ ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ আমলে নেবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রধান কাউন্সিলর, সেক্রেটারি ও ক্যশিয়ারকে সম্মিলিতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। প্রয়োজনে ‘শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ দেশের প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।

৬.

শিক্ষা-সেবার নীতিনির্ধারণী প্ল্যাটফরম

যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষ জাতিকে অন্য কোনো প্রাণি থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা মানুষকে মর্যাদার আসনে বসায়, আবার শিক্ষার অভাব মানুষকে অন্য প্রাণির সাথে তুলনীয় করে। বিষয়টা একটা মানুষের মধ্যে শিক্ষার অস্তিত্ব বিদ্যমান কী-না, তা নির্দেশ করে। তাই শিক্ষা থেকে মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তা করলে, শিক্ষাই হারিয়ে যায়। শিক্ষার অভাবে একটা দেশ বুনো আবহে রূপ নেয়, আবার শিক্ষার উন্নতি একটা জাতিকে উন্নতির শিখরে বয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষা আবার মাত্রা ও মান নির্দেশক। আমাদের দেশের শিক্ষা অন্য আরো অনেক দেশের শিক্ষার তুলনায় নিম্নমানের, না উচ্চমানের তা তুলনার দরকার হয়ে পড়ে না। আসলেই শিক্ষার মান ও পরিবেশের সঙ্কট এ দেশে বিদ্যমান। শিক্ষা পৃথিবীতে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকতর টিকে থাকার অবলম্বন। সেজন্য শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আপস করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান) অর্জিত হয়। অর্জিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবন ও কর্ম নির্বাহ করি। জ্ঞান আমাদেরকে পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম করে।

কার্যত আমাদের দেশে শিক্ষার মান ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা তার মান হারিয়েছে। একটা পক্ষ শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে বিযুক্ত করেছে; উচ্চশিক্ষা হারিয়েছে; টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে খণ্ডিত শিক্ষায় পরিণত করেছে। এভাবে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশই দুর্বল ও হারিয়ে যেতে বসেছি। আবার শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক আয় বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে এবং ইতোমধ্যেই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই অবাঞ্ছিত স্রোতধারার প্রতিকূলে দাঁড়াতে গেলে একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ আপামর শিক্ষিতসমাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজোট

হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এভাবে জোটবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠনের নাম হতে পারে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ'।

'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' একটা কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম হবে। 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এ দেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সামাজিক সেবার উন্নয়নে জাতীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম এ পরিষদ পরিচালনা করবে। দেশের শিক্ষা ও সেবার প্রধান নীতিনির্ধারণী পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। এ পরিষদ আদর্শ ও মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্লাটফরম। এ পরিষদ এ দেশের বিদ্যমান রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, সেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে পরিষদের নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সে মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ পরিষদ দেশে যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, তার সহযেগিতা নেবে। এ কর্মসূচির পুরোটাই জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই এর বাস্তবায়নে পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই নেবে। এ পরিষদ সমাজের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক-সেবা বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়াবে, করণীয় করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ পরিষদ কোনোভাবেই কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সংশ্রব রাখবে না। কারণ এ দেশের রাজনীতি মূলত পচে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখান থেকে বর্তমান ব্যবস্থায় বিশ্রী দুর্গন্ধ ছাড়া দেশ ও সমাজের কল্যাণে ভালো কিছু করা ও পাওয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষা-সেবা পরিষদের সাথে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এলেই পরিষদ দিকভ্রষ্ট হবে। রাজনীতির পরিবেশ ভালো হয়ে গেলে তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই শিক্ষা-সেবা পরিষদকে চিন্তাধারা ও কাজ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ইস্পাতের সার্থকতা সেখানেই যে, টনকে টন লোহার ভিতর দিয়ে সে পার হয়ে যাবে, অথচ সে লোহাতে বিলীন হবে না এবং স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে লোহার মধ্যে থেকেই সে কাজ করে যাবে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। তাই জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ তার নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার, যে কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো পক্ষের বৈধ সহযোগিতা প্রয়োজন মোতাবেক নেবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের একটা গঠনতন্ত্র থাকবে। গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে পারে:

প্রকৃতিঃ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সামাজিক-সেবাধর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যা সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এর মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের মূলনীতিঃ জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্যরা নিম্নবর্ণিত মূলনীতি পালনে সব সময় তৎপর থাকবেন–

১. প্রত্যেক সদস্য স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবিচল। সমাজের প্রতিটা কাজ সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেন।

২. প্রত্যেক সদস্য দেশের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। জীবের প্রতি সদয়।

৩. প্রত্যেক সদস্য সত্যবাদী ও বিনয়ী। চিন্তা ও কাজে নির্মল। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন এবং বয়োকনিষ্ঠদের স্নেহ করেন।

৪. প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিস্বার্থে পরিষদের কোনো কাজ করেন না। দেশের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন, আর্থিক সেবা ও সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে মানবকল্যাণের জন্য প্রতিটি কাজ আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পাদন করেন।

৫. প্রত্যেক সদস্য আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। সমাজের প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজ সদস্যের সামাজিক ও দেশের প্রতি দায়িত্বের অংশ বলে গণ্য করেন।

৬. প্রত্যেক সদস্য ন্যায় কাজের আদেশ করেন এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করেন। সাধ্যমতো নিজ অর্থ-সম্পদ শিক্ষার কল্যাণে ও অভাবী, দুঃস্থ-অসহায়কে দান করেন।

৭. প্রত্যেক সদস্য নিজ উদ্যোগে দেশের কোনো না কোনো এলাকায় যথাসম্ভব 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করেন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করেন।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলীঃ

১. এ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কাজ করা। জনে জনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা; প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, যেমন– ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করতে শেখা, স্বাস্থ্যবিধি শেখা, ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে শেখা, ঘটনা বিশ্লেষণ করতে শেখা,

সমস্যার সমাধান করতে শেখা, ভাবনা-চিন্তা করতে শেখা, সামাজিকতা ও পরিবেশ বিষয়ে শেখা, বিভিন্ন সফট স্কিলস বিষয়ে শেখা ইত্যাদি; কর্মমুখী শিক্ষা, যেমন– পেশাগত শিক্ষা অর্জন, কারিগরি শিক্ষা অর্জন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রতিভার বিকাশ ইত্যাদি; এবং মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা, যেমন– ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলির সম্মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; সামাজিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

২. দেশব্যাপী ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ পরিচালনা, তাদেরকে সমাজসেবার কাজে সহায়তা, সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করা।

৩. দেশব্যাপী স্কুল, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেইটেড/ইউনিফায়েড শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা এবং সকল পর্যায়ে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর সুবিধামতো উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪. এ দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে নীতিমালা ও জনসচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, গোলটেবিল আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা, জনমত গঠন করা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ ও প্রচার করা;

৫. শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া;

৬. দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্য, কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে চাঁদা, দান, আর্থিক সাহায্য, এককালীন অনুদান, বাৎসরিক বরাদ্দ ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা-সেবা পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা;

৭. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’-এর মাধ্যমে আগত ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যোক্তা, শিল্প/বাণিজ্য সংগঠকদের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তাদের গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ সরকারের সহযোগিতায় নিজে কিংবা সরকারের মাধ্যমে দেশের সংশ্লিষ্ট মানসম্মত শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রথমত দশ বছরের জন্য একটি স্ট্রাটিজিক পরিকল্পনা করবে। বিশ্ববাজারে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর যথেষ্ট চাহিদা আছে। চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান-ব্যবসায়ভিত্তিক উচ্চশিক্ষায় বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা সক্ষম অংশকে সরকারি সহযোগিতায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাম্য জনসম্পদে পরিণত করতে পারলেই কেবল তা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কোনো সদস্য কোনো রাজনৈতিক দলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবেন না; পরিষদের কোনো বেতনভুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। কোনো ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ পরিদর্শনে যাতায়াত ভাতা নিতে পারবেন। ‘নির্বাহী পরিষদ’-এর অনুমোদন সাপেক্ষে ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য’, সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য, ফেলো সদস্য জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কাজে সম্মানী নিতে পারবেন।

এছাড়া জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাজের আওতা ও কাজের ধরনধারণ সময়ের গতিশীলতায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সমাজজীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।

‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ গঠন: ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটা ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ’ (এক্সিকিউটিভ এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিল) থাকবে। নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদে একজন প্রেসিডেন্ট; তিন জন ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ভাইস-প্রেসিডেন্ট– এডুকেশন এ্যান্ড ট্রেইনিং; ভাইস-প্রেসিডেন্ট– রিসার্স এ্যান্ড ইনোভেশন; এবং ভাইস-

প্রেসিডেন্ট– জেনারেল); একজন সেক্রেটারি জেনারেল; একজন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি; তিন জন জয়েন্ট-সেক্রেটারি জেনারেল; একজন সেক্রেটারি– এডুকেশন এ্যান্ড ট্রেইনিং; একজন সেক্রেটারি– রিসার্স এ্যান্ড ইনোভেশন; চার জন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি; একজন সেক্রেটারি– মিডিয়া এ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্‌স; একজন সেক্রেটারি– লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স; একজন সেক্রেটারি– ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি; একজন সেক্রেটারি– স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স এবং একজন সেক্রেটারি– সোস্যাল ওয়েলফেয়ার-সহ আরো ৫ জন ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ সদস্য’ (এক্সিকিউটিভ এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিলর) নিয়ে মোট ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা সভা হবে। এ দেশের শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের তালিকা থাকবে। তারা পরিষদের ‘সাধারণ সদস্য’ বলে পরিচিত হবেন। সাধারণ সদস্য ছাড়াও ‘ফেলো সদস্য’ ও ‘আজীবন সদস্য’দের তালিকা থাকবে যারা সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজে আজীবন নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন বলে ঘোষণা দেবেন। প্রতিটি শিক্ষা-সেবা সমাজের ‘প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর’ পদাধিকারবলে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের ‘সোসাইটি কাউন্সিলর’ হিসেবে থাকবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার এবং সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক স্বাধীন মতামত প্রদানের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর পরিচালনা সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ‘এক্সিকিউটিভ এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিল’-এর মেয়াদ ছয় বছর হবে। ‘এক্সিকিউটিভ এ্যান্ড গভর্নিং কাউন্সিল’ নির্বাচনে কোনো প্যানেল থাকবে না। প্রতিটা পদের বিপরীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কোনো সদস্য নির্বাচনে একটি পদে প্রার্থী হতে পারবেন। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলির উন্নতিসাধন ও গঠনমূলক দিক-নির্দেশনার জন্য দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি ‘বোর্ড অব অ্যাডভাইজারস’ থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ তাঁদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। অ্যাডভাইজারদের নাম ‘আগে আসলে আগে থাকবেন’ ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত হবে। তাঁরা পরিষদের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করবেন। ঢাকা শহরে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিস থাকবে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ’-এর সভা প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছর আর্থিক বছর শেষে বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলিকে সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য এবং মূল্যায়নের জন্য 'নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ'-এর অধীন চারটি সেল থাকবে: ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেল; ২. গবেষণা ও উদ্ভাবন সেল; ৩. মিডিয়া এ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স সেল; এবং ৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা সেল। সংশ্লিষ্ট সেলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি যথাক্রমে প্রতিটি সেলের সভাপতি এবং সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করবেন। ফাইন্যান্স সেক্রেটারি তহবিল ব্যবস্থাপনা সেলের সভাপতি হবেন। সেলগুলো পরিষদের সাথে একাট্টা হয়ে পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবে এবং কার্যাবলি মূল্যায়ন করবে। প্রত্যেক সেলের জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের অধীনে একটা অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র সংগঠন থাকবে। বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ও সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা, ছাত্রছাত্রীদের মানবিক চরিত্র গঠনে সহযোগিতা করা, জনসংযোগ রক্ষা করা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে তাদের কাজ। নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদের 'সেক্রেটারি– স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স' অরাজনৈতিক এ ছাত্র সংগঠনের প্রধান হয়ে কাজ করবেন।

'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ'-এর গঠনতন্ত্রে পরিষদ গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। শিক্ষা-সেবা পরিষদের একটা যুতসই ও কার্যকর 'আর্থিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' এবং 'ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' থাকবে। 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫ থেকে ২৫ জন ট্রাস্টী-বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা ট্রাস্ট বোর্ড' গঠন করতে হবে। ট্রাস্ট 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ) বা National Council for Education and Services (NCES) নামে পরিচিত হবে। পরিষদের অধীনে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' এদেশের প্রত্যেক এলাকায় কাজ করবে।

অর্থসংস্থান: পরিষদের অফিস বেয়ারার ও যে কোনো সদস্য পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্ব-উদ্যোগে অর্থের সংস্থানের জন্য এগিয়ে আসবেন। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্যদের মাসিক চাঁদা পরিষদের নিয়মিত আয় বলে গণ্য হবে। দেশের শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, সরকারের নিয়মিত দান, সাহায্য, এককালীন অনুদান, সাদকা, বাৎসরিক জাকাত ইত্যাদি পরিষদের সংশ্লিষ্ট তহবিলে এসে জমা হবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ আইন বলে নিবন্ধিত হবার পর পরিষদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা বা সরকারের কাছে এককালীন অনুদানের জন্য আবেদন করতে

পারে। অনুদানের টাকায় পরিষদ সাধারণ তহবিল গঠন করতে পারে। পরিষদের ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে পরিষদের কার্যক্রম বিষয়ে কোনো আর্থিক প্রজেক্ট বা গবেষণা প্রজেক্ট পরিষদের ব্যানারে হাতে নিতে পারে। সেখান থেকে প্রাপ্ত আয় পরিষদের আয় বলে বিবেচিত হবে। পরিষদ কোনো দান বলে বা ক্রয়ের মাধ্যমে কোনো স্থায়ী বা আর্থিক সম্পদ প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে প্রাপ্ত আয় ও সুবিধা পরিষদের আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সময়ের প্রয়োজনে আমাকে শিক্ষা-সেবা সমাজ ও জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ গঠনের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এর বিকল্প অনেক কিছু আমি ভেবেছি; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে সেগুলো প্রায়োগিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে না বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ‘এসডিজি’ বা ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের শিক্ষাহীনতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাজনীতি, অপশাসন, আইনের প্রয়োগহীনতা দেশ ও সমাজের জীবনীশক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে ক্রমশই খোলা বানিয়ে ফেলছে। অথচ বিষয়গুলো অলক্ষ্য ও অবিবেচনীয় রয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে ধেয়ে চলেছে। বর্তমান দেখা চোখে, কোনো রাজনৈতিক দল প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার ফলপ্রসূ কোনো বার্তা নিয়ে এগিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আবার জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে এ দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত। যে কোনো মূল্যে এবং যে কোনো উপায়ে শিক্ষায় আদর্শ, নৈতিকতা, সততা ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষায় জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন করে জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। দুঃস্থ-অসহায়কে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পায়ে পায়ে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। সবকিছুর মধ্যে যেন রাজনীতির বিষবাষ্প না ঢুকতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দেশে এখনো গ্রামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থ-সহায়তা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। সুসম উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা দরকার। সেজন্য শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ উন্নীতকরণ, মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল্‌স প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং সুদমুক্ত

আর্থিক সহায়তা অধিক উপযোগী। সে-সাথে পল্লী এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কৃষিভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রয়োজনীয়তাও রয়ে গেছে। এতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কম মজুরিতে শ্রমের নৈকট্য ও সহজলভ্যতা বাড়ে। আবার শ্রম-জোগান ব্যবস্থা একটা ভারসাম্যে উপনীত হয়। এসব বিবেচনায় শিক্ষা-সেবা সমাজ ও জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যক্রম সমাজ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়া এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এসডিজি-১ (নো পোভার্টি), এসডিজি-৪ (গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ) এবং এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম-সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য এ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ও পদের শিক্ষা-সচেতন ব্যক্তিবর্গ 'শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এ দেশের শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে সময়োপযোগী গঠনমূলক ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।

উপসংহার: জীবন ও সমাজ চলে জীবন ও সমাজের বাস্তবতা দিয়ে; উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ দিয়ে। যত তত্ত্বকথাই আমরা বলিনে কেন, বাস্তবতার কাছে অনেক তত্ত্ব মার খেয়ে যায়। অনেক কিছুই আমরা চোখে দেখি, অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এর বাইরে আমরা যাইনে। নিজের চোখ ও কানকে কেউই আমরা অস্বীকার করিনে। এরই নাম অভিজ্ঞতা– নিরেট বাস্তবতা। তাই তত্ত্ব ও তথ্যকে বাস্তবতার নিরিখে আগে যাচাই করে নিই। আমি বলি, 'যা কিছুই চালান, শিক্ষা দিয়ে চালান'। নিজেদেরকে আগে আমরা শিক্ষিত করি। তারপর সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই সাথে হবে। আমি বিশ্বাস করি, সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিক্ষার উন্নয়নের সহগামী। এই শিক্ষাটা আবার শিক্ষা হলেই চলবে না, পরিকল্পিত সুশিক্ষা হতে হবে। সামাজিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষার গুণগুলো, যেমন– সততা, মানবিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সামাজিক মূলবোধ প্রভৃতি থাকতে হবে। এই গুণগুলোর অবর্তমানে শিক্ষা যে কুশিক্ষায় রূপ নেয়, তা হয়তো বাস্তবতার বিচারে কেউই অস্বীকার করবে না। সুশিক্ষার এই গুণগুলোকে (আইটেমস অব ইনফরমেশন) স্বাধীন চলক হিসেবে বিবেচনা করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা ইনডেক্স তৈরির মাধ্যমে আমরা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করে এর সঠিকতা যাচাই করেও দেখতে পারি। বেরিয়ে আসবে, সুশিক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নে আদৌ ভূমিকা রাখে কি না? বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় শিক্ষা-সেবা সমাজ ও পরিষদ এ দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারবে– সেটাই এ সমাজ ও পরিষদের সার্থকতা।

সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এই শিক্ষা কীভাবে দেওয়া সম্ভব? বাস্তবে কি শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে? আমরা তো সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কতভাবেই-না শিক্ষার কথা বলে আসছি, কতভাবেই-না শিক্ষার উন্নতি করছি; কিন্তু সুশিক্ষিত সমাজ ও জাতি তৈরি করতে পারছি কই? বাস্তবতা কী বলে? এতটা বছর তো শিক্ষা প্রশাসন এ দেশে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'পরিচালনা পর্ষদ' কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে শিক্ষার এ বেহাল দশা কেন? আমাদের কি কোনো করণীয় নেই? আমি সচেতন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক উপাদান শিক্ষাকে নীচের দিকে ক্রমশই টেনে নামাচ্ছে। টানতে টানতে শিক্ষাকে অনেক নীচে নিয়ে গেছে। সমাজে শিক্ষার মান নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উঠছে। এ দেশের বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ প্রায় সবাই একই কথা বলছেন। আমরা সবাই তা চোখে দেখছি, শুনছি; অথচ কোনো কান-মুখ নাড়ছিনে। বাস্তবতাও তাই বলছে। সেজন্য চেয়ে চেয়ে দেখে, কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় কি আমাদের আছে? এ সময়ে প্রয়োজনীয় কাজ না করে বসে থাকলে এ-ধারা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। কথায় আছে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। নিতান্ত অসময় আসার আগেই কাজটা শুরু করলে অসুবিধা কী? লালন গেয়েছেন, 'অসময়ে কৃষি করে, মিছেমিছি খেটে মরে; গাছ যদি হয় বীজের জোরে, ফল ধরে না, তাতে ফল ধরে না; সময় গেলে সাধন হবে না।' আমরা কি লালনের সতর্কবার্তা মেনে চলবো না? শিক্ষা-সেবা সমাজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এখানেই। এই শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলী-উদ্রেককারী শিক্ষা। শিক্ষা মানবিক গুণ বিবর্জিত হলে সেটা আর শিক্ষা থাকে না। কুশিক্ষায় রূপ নেয়– এ দেশের বাস্তবতা তার প্রমাণ। শিক্ষার অভাবই সকল দুর্গতি, দুর্ভোগ, দুর্ভাগ্যের মূল। সেজন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রতিটা অফিসে, সমাজ পরিচালনায়, সমাজগঠনে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দিতে হবে; তবেই রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে শান্তি ফিরে আসবে, তা টেকসই হবে। কালক্রমে সমাজ-সংস্কৃতিতে রূপ নেবে। অফিস-আদালতে কাজের পরিবেশ ফিরে আসবে। দেশে সুশাসন ফিরে আসবে। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হবে। শুরুটা একবার না করতে পারলে শিক্ষার সুফল যুগ যুগ ধরে অধরাই রয়ে যাবে। দেশ ও জাতি ক্রমশই পিছিয়ে যাবে। তাহলে শিক্ষার পরিবেশ কীভাবে গড়বো? পরিবেশ গড়া ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষার অগ্রগতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করা একটি সহজ পথ।

আমরা দেশের আনাচে-কানাচে, রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছি। রাজনীতির নীতিহীনতা ও মানবিক গুণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সমাজজীবন,

সমাজকর্ম, মানবসেবা, শিক্ষাব্যবস্থা নষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, তাদের দলীয় বালবাচ্চাদের স্বভাব, চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গেছে। সাথে সাথে মানবসম্পদের বৃহৎ একটা অংশও ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম মানব-আপদে পরিণত হয়েছে। তাদের ভ্রষ্টাচারী চিন্তা-চেতনাকে আবার ভালো পথে পরিচালনা করাটা এত সহজ নয়। কেউ স্বীকার না করলেও এটা নিখাদ বাস্তবতা। আমাদের চিন্তা-চেতনা খারাপ হয়ে গেছে বলেই-না আমাদের কাজ খারাপ হয়ে গেছে; সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খারাপ হয়ে গেছে। তাই কবে রাজনীতি ভালো হবে, তারপর চিন্তা-চেতনা, সমাজজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা ভালো হয়ে যাবে– এটা দুঃস্বপ্ন ও দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তা-চেতনা আপনাআপনি ভালো হয়ে যায় না। বরং অন্য বিকল্প পথে শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজজীবন তথা মানবসম্পদ ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারলেই রাজনীতি সুস্থধারায় ফিরে আসবে। এই বিকল্প পথই ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ ও ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’। এজন্য প্রথমেই দরকার সমাজজীবনে সুশিক্ষা, সুস্থ চিন্তা-ভাবনার প্রশিক্ষণ ও মানবিক গুণের চর্চা শুরু করা। সে-সাথে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে যেসব নেতারা আছেন তাদের মন-মানসিকতায় সুস্থ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হলে দেশে মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে। ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ সে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

সমাজ-সংসারে ভালো মানুষ, খারাপ মানুষ দু-ধরনের মানুষই তো আছে। সংখ্যায় কমবেশি হতে পারে। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট তা বলে; বাস্তবতাও তা-ই বলে। খারাপ শ্রেণির মানুষ দিয়ে যেমন ভালো কাজ হয় না, তেমনি ভালো কাজের জন্য ভালো চরিত্রের মানুষ প্রয়োজন হয়। সমাজে শিক্ষা ও সেবার উন্নতি করা, মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকা, ভালো মন-মানসিকতা গড়তে প্রশিক্ষণ দেওয়া নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। দেশের প্রতিটা সরকারও জনকল্যাণে জনসেবার নামে এসব কাজ করার জন্য দায়িত্ব নেয়। মানবসেবা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা-সেবা সমাজ সমাজের অভ্যন্তর থেকে ভালো কাজে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের বেছে নিয়ে জনসেবার মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণমুখী কাজ ও ধর্ম পালনে এগিয়ে আসার একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফরম তৈরি করছে, যা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণকে নিশ্চিত করে। এ সংগঠন যে কোনো সরকারের মানবকল্যাণে সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করতে পারে।

এ দেশে সুদীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা ও সমাজসেবা উপেক্ষিত হয়ে আসছে। কোনো সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা ও সেবার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা মাঠ পর্যায়ে

বাস্তবায়ন অনেকটাই হয় না। মাঝপথে সিস্টেম লস হয়ে যায়। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া এ দেশে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আবার শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের ভূমিকাই মুখ্য। তাই শিক্ষার সাথে সরাসরি যারা জড়িত তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্যই শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক–এই ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। এই তিন পক্ষের সম্পর্কের উন্নতি ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, যে দায়িত্ব শিক্ষা-সেবা সমাজ পালন করবে। এজন্য দেশের পুরো জনগোষ্ঠীকে এলাকাভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটা এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা-সেবা সমাজ অভিভাবকদের সুশিক্ষা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ অভিভাবকদের সাথে নিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে নিশ্চিত করবে। এভাবে সামাজিক শিক্ষাবলয় গড়ে তুলতে পারলে সমাজে শিক্ষার উন্নতি হবে, সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও অপচিন্তা অনেকটাই কমে আসবে।

কোনো সমাজ, দেশ ও জাতি গড়তে হলে সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটা সমাজে বসবাসরত মানুষের একটা সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত অংশকে দিয়ে সেই সমাজের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সমাজের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করলে সঠিক সময়ে সঠিক লোক দিয়ে সঠিক কাজটা করা সম্ভবপর হয়। আমাদের সমাজের মূল সমস্যা হলো অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। বর্তমান সমাজে মানুষকে ভালো কথা বলার লোক খুবই কম। সুশিক্ষিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এক শ্রেণির লোক সমাজে থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেউ কেউ সমাজের করুণ-ভগ্নদশা নিয়ে ভাবলেও তারা আবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমাজে অবস্থান করেন। এদেরকে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোকের সহযোগিতা নিতে হবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ সমাজের ভালো লোকগুলোকে একত্রিত করবে। তাদেরকে সমাজ উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ এ কাজ করবে। পবিত্র কুরআনে সামগ্রিক এ কাজগুলোকে যথার্থই এভাবে বলা হয়েছে, ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।’ (আলে ইমরান, ৩:১০৪)। আমরা

সমাজের কল্যাণমুখী কাজে একদল লোক নিয়োজিত করতে চাই। এখানে কল্যাণ কীসে হয়, সৎকাজ কোনগুলো, অসৎকাজই-বা কোনগুলো– সকল বিবেকবান ও আত্মসচেতন লোকই তা জানেন ও বোঝেন। আমরা সমাজকাঠামোর মধ্য থেকে আলোকিত-স্বেচ্ছাসেবী একদল লোককে কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক সমাজকল্যাণে (সামাজিক শিক্ষা ও আর্ত-মানবতার সেবায়) কাজে লাগাতে চাই। তাতে সামাজিক কল্যাণ হবে। শিক্ষা-সেবা সমাজের কাউন্সিলররাও সামাজিক জনগোষ্ঠীর কাছে সম্মানিত হবেন।

এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে শিক্ষা-সেবা সমাজের কাজ করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরকার দেশ ও সমাজের কল্যাণে শিক্ষা-সেবা সমাজ ও পরিষদকে অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা দেবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

যে কোনো ধর্মেরই দুটো দিক আছে– একটি আনুষ্ঠানিক দিক এবং অন্যটি হচ্ছে পার্থিব কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় প্রায়োগিক দিক। আমরা যদি হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে আনুষ্ঠানিকতার সাথে সাথে ধর্মের প্রায়োগিক দিকের চর্চা করি, সমাজব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করি, কাজে-কর্মে-চিন্তায় সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধকে ছড়িয়ে দিই, তাহলে দল মত নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজে শান্তি বিরাজ করে, অভাব-অনটন অনেকটাই দূর হয়, অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা গড়ে ওঠে, সুস্থ ধারায় মানুষের সামাজিক বিকাশ হয়, শান্তির সুশীতল ছায়ায় পরিবার ও সমাজ ভরে যায়। স্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হয়। অসুবিধা হচ্ছে, আমরা চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে সুস্থতা না এনে, কখনো বিপরীতধর্মী চিন্তা ও কাজ করে, প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতবাদ জারি করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, প্রকৃতিপ্রদত্ত সুবিধাকে অকাতরে ভোগ করতে চাই। এটা প্রকৃতির নিয়মের ব্যত্যয়। শিক্ষা-সেবা সমাজ কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করে না। আবার ধর্মীয় অজ্ঞতা, কূপমণ্ডূকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধেও যেতে চায় না। ধর্ম ও প্রকৃতির সহগামী হয়ে কাজ করে। সুস্থ ও সুশিক্ষিত সমাজ গড়তে চায়। আর্থ-সামাজিক উন্নতি চায়। উদ্দেশ্যের অনুকূলে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এটা শিক্ষা-সেবা সমাজ ও পরিষদের টিকে থাকার অবলম্বন।

জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষা ও সেবা না দিতে পারা আমাদের জাতীয় সমস্যারই একটা বড় অংশ। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে এবং মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক

গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা– এই ত্রিমুখী শিক্ষার প্রয়োজন বলে আমার বিশ্বাস। এই ত্রিমুখী শিক্ষাকে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নে দেশে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা-সেবা সমাজ দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে করণীয় করবে।

মূলত মানবকল্যাণ রয়েছে দুটো জায়গায়– সামাজিক সুশিক্ষায় এবং দরিদ্র-নিঃস্ব, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তায়। আমাদের সমাজে দারিদ্র্যসীমার নীচে অনেক পরিবার বাস করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থাপনার কারণে এরা সুবিধাবঞ্চিত, সর্বহারা। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সুবিধা পাওয়া এদের অধিকার। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে এদেরকে সে সুবিধা দিতে হবে। এটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সরকারই যখন ক্ষমতায় থাকে এই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাজেটের একটা অংশ ব্যয় করে। দুঃখের বিষয় হলো, ত্রুটিযুক্ত বণ্টনব্যবস্থার কারণে দরিদ্র-নিঃস্ব, অসহায় শ্রেণির মানুষেরা উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার পায় না। মানসম্মত শিক্ষা ও উন্নত জীবনযাপন এদের কাছে আজীবন অধরাই রয়ে যায়। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সফট স্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আবার কখনো রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ অব্যাহত রাখতে এবং বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

এ দেশে সমাজের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী লেখাপড়া শিখছে না, অনেকেই নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে যাচ্ছে। টেকনিক্যাল শিক্ষাও শিখছে না, উচ্চশিক্ষায়ও যাচ্ছে না। আবার টেকনিক্যাল শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় যারা যাচ্ছে তারা সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলী-জাগানিয়া শিক্ষা শিখছে না। সামাজিক শিক্ষা শূন্যের কোঠায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, এসব সীমাবদ্ধতার সরাসরি স্টেকহোল্ডার কে বা কারা? প্রত্যক্ষভাবে কাদেরকে ভুগতে হচ্ছে? নিশ্চয়ই উত্তরটা এরকম হবে, স্টেকহোল্ডার হচ্ছে ছাত্রছাত্রী নিজেরা (যদিও বয়স কম হওয়ার কারণে তাদের হালকা বুঝ, তারা তাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ে অতটা ভাবে না), তাদের অভিভাবকমহল এবং তারা যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের লোকজন। স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকেরাও স্টেকহোল্ডার বটে। স্টেকহোল্ডারদের একাংশের মাধ্যমে অন্য স্টেকহোল্ডারদেরকে যদি প্রয়োজনীয় পরামর্শ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সেবা দিয়ে গড়ে তোলা যায়, তবে সে ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। শিক্ষা-সেবা সমাজের সদস্যরা

যখন শিক্ষা ও আর্থিক সেবার ডালি নিয়ে ভুক্তভোগীদের সামনে হাজির হবেন, কিছুদিনের মধ্যে সদস্যরা সমাজের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রে পরিণত হবেন। সমাজবিজ্ঞান তাই বলে। কাজের স্বীকৃতি পাবেন, নিজেরাও আত্মতৃপ্ত হবেন। মনোবিজ্ঞানও তাই বলে। আমি নিজেও একটা সমাজে শিক্ষা-সেবার কাজ নিয়ে হাজির হয়েছি। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সমাজের মানুষ খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজে অংশ নিয়েছে। উদ্দেশ্য সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোট কথা হলো, এ দেশে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন জনসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই, যাদের মানবিক মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। এতে শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সহগামী হবে। এজন্য দেশব্যাপী জনসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ ও ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’কে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইচ্ছে যদি থাকে ভালো হবার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও জাতি গড়ার– মাধ্যম হতে পারে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ ও ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’। ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ ও ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ একটা পথ (অ্যাপ্রোচ), এর কর্মকাণ্ড একটা জাতির লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাথেয়।

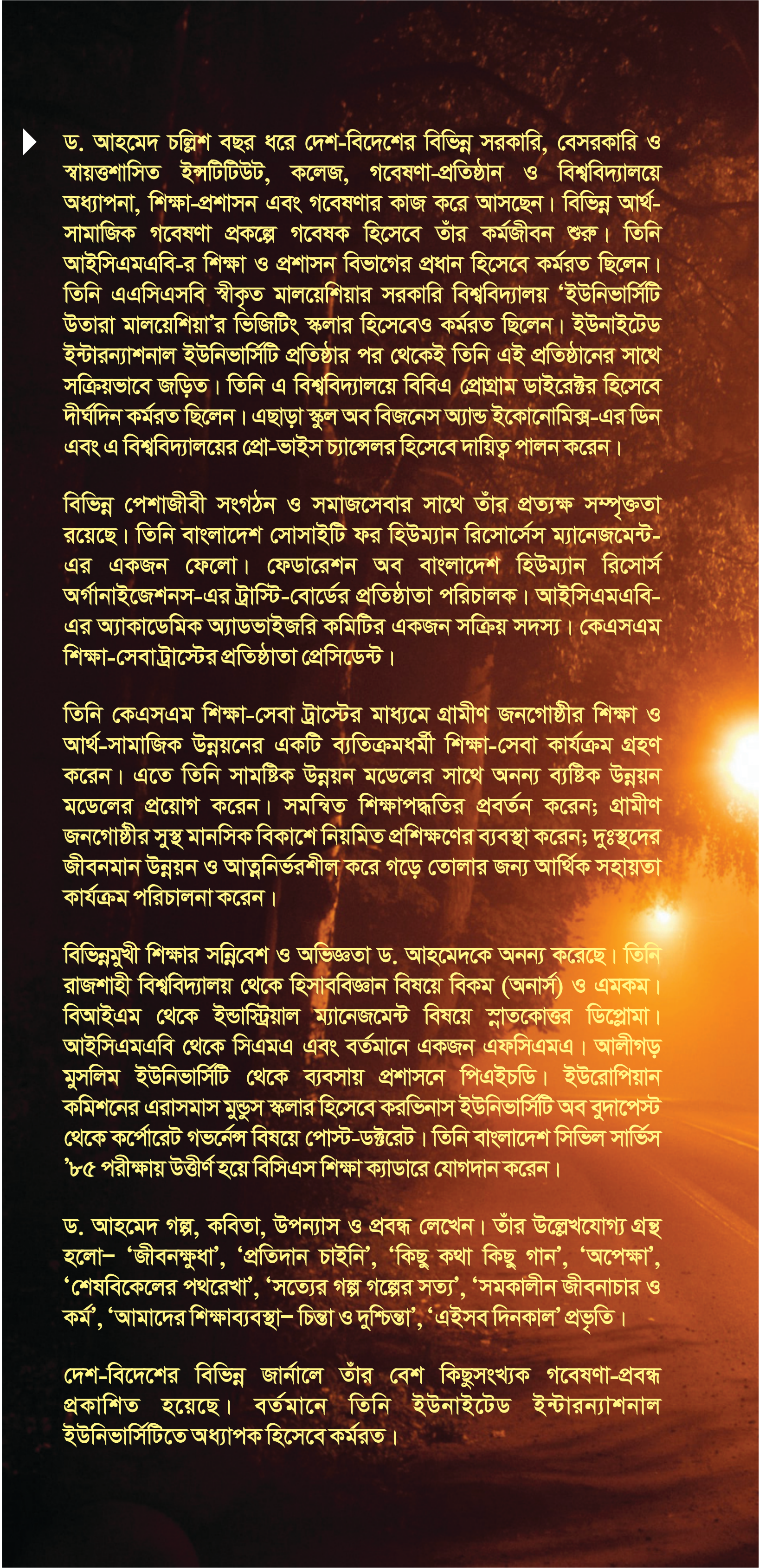

ড. আহমেদ চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তিনি সামষ্টিক উন্নয়ন মডেলের সাথে অনন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল' প্রভৃতি।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।